ভারতীয় দর্শনে সংশয়বাদ এবং তার ন্যায়দর্শনসম্মত নিরসন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পিএইচ.ডি (কলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

বিজয় সরদার

জানুয়ারী, ২০২২

কলা সংসদ (দর্শন বিভাগ)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

Certificate

Certified that the thesis entitled "**ভারতীয় দর্শনে সংশয়বাদ এবং তার ন্যায়দর্শনসম্মত নিরসন**", submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my own work carried out under the supervision of Professor Proyash Sarkar, Department of Philosophy, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Date:

Candidate

Date:

প্রাক্ কথন

এই গবেষণা নিবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত হল। এই গবেষণা নিবন্ধটি রচনার একটি প্রেক্ষিত রয়েছে। দর্শন বিভাগে পঠন পাঠনের সময় আস্তিক্যবাদী দর্শন সম্প্রদায়গুলির নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার মনে নানানরকম প্রশ্ন দেখা দিত। মনে হত, যে বিধিবদ্ধ সুসংগঠিত দর্শন সৌধ গড়ে তুলতে বিভিন্ন দার্শনিক ও সম্প্রদায় তৎপর, সেই দর্শন সৌধ অনড় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে প্রতি প্রশ্ন করার একটা ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে সুপ্ত ছিল। এরপর ২০১৩ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) প্রদত্ত জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ (NET-JRF) প্রাপ্তির সুবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে পিএইচ.ডি করার সুযোগ পাই এবং বর্তমান গবেষণাপত্রের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করতে থাকি।

এমতাবস্থায় ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করি। এর ঠিক দু'মাস পরেই (ডিসেম্বর, ২০১৬) রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হই সহকারী অধ্যাপকের পদে। ফলে নতুন কর্মজীবনের কর্ম ব্যস্ততার দরুন গবেষণার কাজটিকে যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছিল না। যদিও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গেই গবেষণার কাজকেও আমি সমানভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করতাম। এমন অবস্থায় ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে সারা বিশ্বব্যাপী অতিমারির (COVID-19) কারণে জনজীবন স্তব্ধ হতে শুরু করে। শুরু হয় লকডাউন, চালু হয়

ওয়ার্ক ফ্রম হোম। আর এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলাকালীনই গবেষণার কাজটিকে আমি বাস্তবায়িত করি।

যাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে আমার এই গবেষণার কাজটি কখনই সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব হতো না তিনি হলেন আমার পিএইচ.ডির তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর প্রয়াস সরকার। তিনি কখনই তাঁর নিজ চিন্তাভাবনা আমার উপর চাপিয়ে দেননি, বরং আমার নিজ চিন্তাভাবনাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাই স্যারের কাছে আমি সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সকল সহকর্মীকে, যাঁদের কাছে আমি কোনও না কোনও ভাবে ঋণী, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে নানা তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি দর্শন বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রী বিদ্যুৎ সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণাকালীন বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গের উৎসাহ তো ছিলই, কিন্তু যাঁদের সর্বক্ষণের প্রেরণাকে পুঁজি করে নিজ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যাওয়া সেই পিতা-মাতাকে আমার প্রণাম। পরিশেষে, যার কথা না বললেই নয় সে হল আমার সহধর্মিনী অর্চিতা। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ এই গবেষণার কাজে নানাভাবে আমি তাঁর সাহায্য পেয়েছি।

বিনীত নিবেদক

বিজয় সরদার

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রাক্ কথন i-ii

প্রথম অধ্যায় **১-১০**

ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায় **১১-৩৬**

সংশয়বাদের সীমারেখা নিরূপণ

২.১. সংশয়বাদ এবং তার বিভিন্ন অর্থ

২.২. সংশয়বাদের নানা রূপ

২.৩. সংশয়বাদের পাশ্চাত্য ধারা

তৃতীয় অধ্যায় **৩৭-৬৭**

ভারতীয় সংশয়বাদ ও বৈতণ্ডিক প্রসঙ্গ

৩.১. বৈতণ্ডিক প্রস্থানের রূপ নির্ণয়

৩.২. বিশিষ্ট বৈতণ্ডিক হিসাবে সঞ্জয়, নাগার্জুন ও শ্রীহর্ষ

৩.৩. বৈতণ্ডিক জয়রাশি ভট্ট ও তাঁর সার্বিক সংশয়

৩.৩.১. নৈয়ায়িক সম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে যুক্তি

চতুর্থ অধ্যায় **৬৮-৮৪**

নাগার্জুন কর্তৃক প্রমাণ ও প্রমেয়ের ধারণা খণ্ডন

৪.১. *বৈদল্যপ্রকরণ* ও নাগার্জুনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়

পঞ্চম অধ্যায় **৮৫-১১৭**

প্রমাণবাদীর আপত্তি খণ্ডনে নাগার্জুন

ষষ্ঠ অধ্যায় **১১৮-১৩৯**

ন্যায় কর্তৃক বৈতণ্ডিক মত নিরসন ও প্রমাণ-প্রমেয়ের প্রতিষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায় **১৪০-১৪৬**

সিদ্ধান্ত

গ্রন্থপঞ্জি **১৪৭-১৪৯**

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

দর্শনের ইতিহাসে সংশয়বাদ আবির্ভূত হয়েছিল একটি ত্রাস হিসাবে। প্রাচীন গ্রীসের পাইরো, টিমন এবং তাঁদের অন্যান্য অনুগামীদের হাত ধরে সংশয়বাদের উত্থান হয়। তারপর ধীরে ধীরে সোফিস্ট এবং অ্যাকাডেমিস (Academic) সম্প্রদায়ের দ্বারা ক্রমশ সংশয়বাদ তার ঐতিহাসিক প্রভাব বিস্তার করে। উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে সংশয়বাদ নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। নৈতিক ও ধর্মীয় বিধিগুলির ভিত্তি ছিল প্রত্যাদেশ ও বিশ্বাস। কিন্তু প্রত্যাদেশ ও বিশ্বাস কখনও নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না। তাই ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রগুলি যথাযথ নয়। কারণ তাঁরা প্রকৃতিকে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে গন্য করে 'অতিপ্রাকৃতিক' বিষয় (super natural) কে সংশয় করেন। ধীরে ধীরে সংশয়বাদ দর্শনের সমগ্র ক্ষেত্রে নিশ্চয়তাকে অস্বীকার করে।

যদিও সংশয়বাদের মৃদু আকারটি দার্শনিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তথাপি সেক্সটাসএম্প্রিকাসের মতো পাইরোনিস্টরা সমগ্র বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক অনুসন্ধানের চরম বিরোধীতা করে। সংশয়বাদ জ্ঞানের নিশ্চয়তা বিষয়ে সন্দেহ করে জ্ঞানতত্ত্বের চরম বিরোধীতা করে। জ্ঞানতত্ত্বের পরিচিতি দর্শনের অন্যতম একটি শাখা হিসাবে, যেখানে জ্ঞানের উৎস, বৈধতা, সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্যা হল যদি যথার্থ জ্ঞান বলে কোনও কিছু না থাকে তাহলে জ্ঞানতত্ত্ব বলে আদৌ কিছু কি থাকা সম্ভব? কাজেই সংশয়বাদকে মেনে নিলে জ্ঞানতত্ত্ব বলে কিছু থাকে না। তাই জ্ঞানতাত্ত্বিকদের অন্যতম একটি কাজ

হল যথার্থ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত প্রদান করে সংশয়বাদের মোকাবিলা করা। এইভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব সংশয়বাদ বিরোধী একটি ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

এখন যদি আমরা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে লক্ষ্য করা যায় যে, পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতীয় দর্শনেও সংশয়বাদের প্রভাব ছিল। ভারতীয় দর্শন হল ঠিক একটি উচ্চ অট্টালিকার ন্যায়। একটি অট্টালিকা যেমন কতকগুলি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ঠিক তেমনি ভারতীয় দর্শনে অট্টালিকাটি মূলত চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। সেই স্তম্ভগুলি হল প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমিতি। প্রমাণ হল প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়। প্রমেয় হল জ্ঞানের বিষয়। প্রমাতা হল জ্ঞানলাভকারী ব্যক্তি এবং প্রমিতি হল যথার্থ জ্ঞানের ফল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে একজন প্রমাতা প্রমাণের দ্বারা কোনও বিষয় সম্বন্ধে প্রমিতি লাভ করে থাকে। এইভাবে প্রমাণের ধারণা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। জ্ঞান এবং জ্ঞানের বৈধতা সম্পর্কে আলোচিত বিষয়কে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে প্রমাণশাস্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যদিও 'প্রমাণ' শব্দটি সর্বদা একক অর্থ বহন করে না। 'প্রমাণ' শব্দটি 'প্রমা' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়। 'প্রমা' শব্দটি আবার 'মা' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট বা যথার্থ এবং 'মা' শব্দের অর্থ জ্ঞান সুতারাং 'প্রমা' শব্দের অর্থ হল যথার্থ জ্ঞান। দুটি ভিন্নভাবে 'প্রমাণ' শব্দটি উৎপন্ন হতে পারে। প্রথমত, করণবাচ্যে 'প্রমাণ' শব্দটি হল 'ল্যুট' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ হল যথার্থ জ্ঞানের করণ (প্রমা করণম্ প্রমাণম্)। আবার যদি 'প্রমাণ' শব্দটির ক্ষেত্রে ল্যুট্ প্রত্যয়টিকে ভাববাচ্যে গ্রহণ করা হয় তাহলে 'প্রমাণ' বলতে বোঝায় যথার্থজ্ঞান বা প্রমাকে। তবে সাধারণত জ্ঞানতত্ত্বে 'প্রমাণ' শব্দটি জ্ঞানের উপায় হিসাবে গৃহীত হয়।

একইভাবে ‘প্রমেয়’ শব্দটিকে দ্ব্যর্থক অর্থে গ্রহণ করা হয়। অর্থ দুটি হল- সীমিত অর্থে (restricted) এবং সাধারন অর্থে (general)। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে ‘প্রমেয়’ বলতে বোঝায় বিষয়কে। যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্তি সম্ভব হয়। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম প্রমেয়ের এই অর্থটি গ্রহণ করে বারো প্রকার প্রমেয়ের কথা বলেছেন। সেগুলি হল- আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ। যদিও প্রমেয়র আক্ষরিক অর্থটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এই সাধারণ অর্থে ‘প্রমেয়’ বলতে বোঝায় জ্ঞানের বিষয়। এই অর্থে প্রমেয় বলতে বোঝায় জগতের সবকিছুকে, সেগুলো জ্ঞাত হোক বা অজ্ঞাত হোক।

বেদের প্রামাণ্যের স্বীকার বা অস্বীকারের নিরিখে ভারতীয় দর্শনের প্রায় সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায় উপরোক্ত চারটি নীতি (প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমিতি) সম্বন্ধে সহমত। চার্বাক ছাড়া প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মুক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং তাঁরা মনে করেন যে, প্রমেয়ের যথার্থ জ্ঞানলাভের দ্বারা ব্যক্তির মুক্তিলাভ সম্ভব। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ ছাড়া কখনই প্রমেয়ের যথার্থ জ্ঞানলাভ মুক্তির সহায়ক হতে পারে না। এর থেকে প্রমাণিত হয় ভারতীয় দার্শনিকরা প্রমাণের উপর কতখানি আস্থাশীল।

যেহেতু প্রমাণের নিশ্চয়তা দ্বারা প্রমেয় প্রতিপাদিত হয় সেহেতু প্রমাণের প্রকৃতি বা স্বরূপ এবং প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে বিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় দার্শনিকদের অন্যতম একটি প্রধান কাজ। যদিও ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণে বিশ্বাসী, তবে প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে সকল সম্প্রদায় সহমত পোষণ করেন না। চার্বাক সম্প্রদায়

কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ নামক একটি প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্য ও জৈন সম্প্রদায় জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায়, কেবল – এই পাঁচটিকে স্বীকার করেন, তথাপি এই পাঁচটি উপায়কে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের মধ্যে পর্যবসিত করা হয়। ন্যায়দর্শনে উপর্যুক্ত তিনটি প্রমাণের পাশাপাশি অতিরিক্ত উপমান নামক প্রমাণ স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িকরা চারটি প্রমাণ স্বীকার করেন। মীমাংসা দর্শনে প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য দেখা যায়। প্রাভাকর মীমাংসক প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি নামক পাঁচটি প্রমাণ স্বীকার করেন। অন্যদিকে, মীমাংসক কুমারিল ভট্ট প্রভাকরের ন্যায় পাঁচটি প্রমাণের সঙ্গে অনুপলব্ধি নামক অতিরিক্ত আর একটি প্রমাণ স্বীকার করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হল যে, ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি নানারকম প্রমাণের অবতারণা করেছেন। যদিও প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে একে অন্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না। তথাপি তাঁরা সকলেই প্রমাণ এবং প্রমেয়ের ধারণায় বিশ্বাসী। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণ-প্রমেয় বিভাজনে বিশ্বাসী, যদিও কিছু ব্যতিক্রমী সম্প্রদায় আছে যারা প্রমান-প্রমেয়ের বিভাজন স্বীকার করেন না এবং তাঁরা এই প্রমান-প্রমেয়ের চিরাচরিত বিভাজনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। ভারতীয় দর্শনে এই ব্যতিক্রমী সম্প্রদায়কে 'বৈতণ্ডিক' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে এমন একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাঁরা কোন কিছুতে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান না করে সর্বদা অন্যের মতকে সমালোচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন সঞ্জয়। সঞ্জয় ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। সঞ্জয় ও তাঁর অনুগামীরা অন্যের মতকে সমালোচনা করতে গিয়ে মূলত

দ্বান্দিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। পূর্বপক্ষী প্রদত্ত কোন একটি বিষয়ের সম্ভাব্য বিকল্পগুলিকে ধরে নিয়ে তারা সবকিছুকে খন্ডন করতেন। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি পরবর্তীকালে মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং এই পদ্ধতিটি পরবর্তীকালে প্রসঙ্গ পদ্ধতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে নাগার্জুনের হাত ধরে এই প্রসঙ্গ পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে। নাগার্জুন মূলত এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতেন জাগতিক বস্তু সম্পর্কিত শূন্যতা তত্ত্বের রক্ষাকবচ হিসাবে। বস্তুবাদীদের বিশেষত নৈয়ায়িকদের পদার্থের বিভাগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নাগার্জুন খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। ন্যায়দর্শনে ষোলটি পদার্থ স্বীকার করা হয়। সেগুলি হল প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান। যদিও ষোলটি পদার্থের কথা বলা হয় তবে শেষ চোদ্দটি পদার্থ দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায় প্রমাণ এবং প্রমেয় – এই দুটি মাত্র পদার্থ রয়েছে। নাগার্জুন বিতর্কমূলক যুক্তি দ্বারা বস্তুবাদী প্রদত্ত প্রমাণ প্রমেয়ের বিভাজনকে ভিত্তিহীন বলে দাবী করেন।

ভারতীয় দর্শনে জয়রাশিভট্ট ও শ্রীহর্ষের মতো বৈতণ্ডিকরাও শূন্যবাদী নাগার্জুনের পথ অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীহর্ষের মধ্যে সত্ত্বাতাত্ত্বিক প্রাক্স্বীকৃতি (ontological presupposition) লক্ষ্য করা গেলেও জয়রাশির মধ্যে তা ছিল না। জয়রাশি জড়বাদী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কখনও কোনও তত্ত্বের স্বপক্ষে কোনও রকমের যুক্তিপ্রদান করতেন না, বরং সর্বদা সব তত্ত্বের উপপ্লব বা খন্ডন করতেন *তত্ত্বপোপ্লবসিংহ* গ্রন্থে। জয়রাশিভট্টের এই আধিবিদ্যক সংশয়বাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক অথবা জ্ঞানীয় সংশয়বাদের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে, যেটি তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা

করতে সচেষ্ট হন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ তত্ত্বে শ্রীহর্ষের গভীর আস্থা ছিল। অন্যান্য অদ্বৈতবাদীদের মতো শ্রীহর্ষ ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জাগতিক জ্ঞানের বিরোধীতা করতেন। নাগার্জুনও জয়রাশির মতো প্রমাণ প্রমেয় তত্ত্বের বিভাজন স্বীকার করতেন না।

সংশয়বাদ হল এমন একটি অবস্থান যা কেবলমাত্র জ্ঞানতত্ত্বের পরিধি বৃদ্ধির বিরোধীতা করে না, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অচল করে তোলে। আর সংশয়বাদের (সার্বিক সংশয়) এই আক্রমণাত্মক রূপ কেবলমাত্র বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত বচনের সত্যতাকে অস্বীকার করে না, বরং যেকোনো ধরণের শক্তিশালী যুক্তিকেও অস্বীকার করে। সুতরাং সকল জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সংশয়বাদ বিরোধী দার্শনিকদের অন্যতম একটি কাজ হয়ে দাঁড়ায় সর্বগ্রাসী এই সংশয়বাদের মোকাবিলা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রদান করা। 'সবকিছু অনিশ্চিত' – এরূপ সংশয়বাদী যুক্তির মোকাবিলা করতে দেখা যায় আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেঁনে দেকার্তের মধ্যে। এমনকি বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রমুখদের মধ্যেও সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংশয়বাদের মোকাবিলা করতে দেখা যায়। 'ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের' নিশ্চয়তাকে পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ডেভিড হিউম বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত সবকিছুতে সার্বিক সংশয় করেছিলেন। সংশয়বাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে ইমানুয়েল কান্ট বলেছিলেন যে সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদের মধ্যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আবার সংশয়বাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে জি.ই.ম্যুর কমনসেন্সের মতো অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর *Main Problems of Philosophy,*

Philosophical Papers প্রভৃতি গ্রন্থে সংশয়বাদের মোকাবিলা করে অভিজ্ঞতাবাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন।

পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতীয় শাস্ত্রে বিশেষত ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে সংশয়বাদের মোকাবিলা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। নৈয়ায়িকদের মতো বাস্তববাদী (common sense) দার্শনিকরা সংশয়বাদকে কখনও বস্তুবাদী (realistic) দর্শনের থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ দেননি। নৈয়ায়িকরা সর্বদা বৈতণ্ডিক এবং সর্বশূন্যবাদীদের মতো সংশয়বাদীদের বিরুদ্ধে জোরালো আক্রমণ করেন। *ন্যায়সূত্রে*র দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষি গৌতম অপ্রমাণবাদীদের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রদান করেন। প্রমাণ-প্রমেয়ের বিভাজনের বিরুদ্ধে বৈতণ্ডিকরা আপত্তি করতে পারেন এমনটি ধরে নিয়ে সম্ভাব্য আপত্তিগুলিকে উত্থাপন করে বিবাদীপক্ষের (অপ্রমাণবাদী) মতগুলিকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে প্রমাণ-প্রমেয়ের বিভাজন যে যথাযথ তা প্রতিষ্ঠা করেন। অপ্রমাণবাদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণবাদী নৈয়ায়িকের এই আক্রমণ আরও তীব্র হতে দেখা যায় *ন্যায়সূত্রের* ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনীতে।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল নৈয়ায়িকপ্রদত্ত অপ্রমাণবাদের বিরুদ্ধে সকল যুক্তিগুলিকে একত্রিত করে জ্ঞানের দাবী এবং প্রমাণ-প্রমেয়ের বিভাজন যে যথাযথ সেটি তুলে ধরা। এছাড়া উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি, উদয়ন এবং অন্যান্য আরও নৈয়ায়িকরা জ্ঞানতাত্ত্বিক, অধিবিদ্যক এবং নৈতিক সংশয়বাদের বিরুদ্ধে যেসকল যুক্তিপ্রদান করেছেন সেগুলিকে একত্রিত করা এবং তার যাথার্থ্য নিরূপণ করা এই গবেষণার অন্যতম একটি প্রচেষ্টা।

সম্পূর্ণ গবেষণাপত্রটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হবে। যার প্রথম অধ্যায়ে সম্পূর্ণ গবেষণা নিবন্ধটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয়বাদের সীমারেখা নিরূপণ করা হবে। যেখানে সংশয়বাদের সংজ্ঞা, সংশয়বাদের বিভিন্ন রূপের একটি বিশদ বিবরণ প্রদান করা হবে, এছাড়াও সংশয়বাদের পাশ্চাত্য ধারার একটি বিশদ বিবরণ প্রদান করা হবে।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সংশয়বাদ এবং সংশয়ের সমার্থক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে যাদের মধ্যে কট্টর সংশয়ী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাদেরকে ‘বৈতণ্ডিক’ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বৈতণ্ডিকরা যখন একধরনের বিশেষ বাদানুবাদে লিপ্ত হন তখন সেই আলোচনা স্থলটিকে বলা হয় বিতণ্ডা। এই গবেষণা নিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বিতণ্ডা বলতে কী বোঝায় এবং সঠিক অর্থে বৈতণ্ডিক কারা তা আলোচনা করা হবে। বিশিষ্ট বৈতণ্ডিক হিসাবে সঞ্জয়, নাগার্জুন ও শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। এছাড়া প্রমাণবাদীদের বিরুদ্ধে জয়রাশি ভট্ট যেসকল আপত্তিগুলো উত্থাপন করেন সেগুলি আলোচনা করা হবে।

সঞ্জয়, জয়রাশি এবং শ্রীহর্ষের মতো বৈতণ্ডিকরা যে জ্ঞানের দাবীকে অস্বীকার করেন, তা চরম আকার ধারণ করে মাধ্যমিক দর্শনের মধ্যমণি নাগার্জুনের লেখনীর মধ্যে। মাধ্যমিকের ‘শূন্যতা’তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাগার্জুনের *মূলমধ্যমককারিকা* গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক ভূমিকা পালন করে। আবার নাগার্জুনের *বৈদল্যপ্রকরণ* এবং *বিগ্রহব্যবর্তনী* গ্রন্থে নৈয়ায়িকদের মতো বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপাদিত হয়। এই দুটি গ্রন্থে নাগার্জুন প্রমাণপ্রমেয়ের বিভাজনের বিরুদ্ধে তীব্র -

আপত্তি করে চিরাচরিত জ্ঞানের দাবীকে নস্যাৎ করেন। এই গবেষণা নিবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে নাগার্জুন তাঁর *বৈদল্যপ্রকরণ* গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমেয়ের দাবীর বিরুদ্ধে যেসমস্ত আপত্তি দেখিয়ে জ্ঞানের দাবীকে অস্বীকার করেন সেগুলি আলোচনা করা হবে।

প্রমাণ ও প্রমেয়ের ধারণার অসারতা প্রতিষ্ঠায় নাগার্জুন উত্থাপিত যুক্তিগুলি গ্রহণ করলে প্রমাণ ও প্রমেয়ের উচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু প্রমাণ বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে মাধ্যমিকের সর্বশূন্যবাদ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? প্রমাণ ও প্রমেয় যদি শূন্য হয় তাহলে 'সর্বং শূন্যম্' – এই সিদ্ধান্ত অনুপপন্ন হয়। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করে নাগার্জুন তাঁর *বিগ্রহব্যবর্তনী* গ্রন্থের ৩১-৫১ নং কারিকাতে প্রমাণবাদীদের সম্ভাব্য সেই আপত্তির উত্তর দিয়ে প্রমাণ, প্রমেয়ের বিভাজনটি যে অর্থহীন তা প্রমাণ করেছেন। এই গবেষণা পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

গবেষণা নিবন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাগার্জুনের মতো শূন্যবাদী ও অপ্রমাণবাদীরা জ্ঞানের দাবীর বিরুদ্ধে যেসমস্ত আপত্তি করেছিলেন (বিশেষত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি, অনবস্থা দোষ) নৈয়ায়িকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রমাণের বৈধতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সেই আপত্তিগুলির খণ্ডন ও মণ্ডন করার চেষ্টা করা হবে। যেখানে সমালোচনা পূর্বক দেখানো হবে যে প্রমাণ এবং প্রমেয়ের বিভাজন যদি যথাযথ না হয়, তাহলে কালের দাবী অসম্ভব হয়ে পরে এছাড়া প্রমাণের বৈধতার বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করেন তাঁদের আপত্তির বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকরা যেসকল যুক্তি প্রদান করে প্রমাণের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করেন সেটি তুলে ধরা হবে। একইসঙ্গে নৈয়ায়িকদের জ্ঞানের বৈধতার বিরুদ্ধে যে অনাবস্থা

দোষের আপত্তি করা হয় সেই আপত্তির খণ্ডন করে প্রমাণ-প্রমেয়ের বিভাজন যে যথাযথ নৈয়ায়িকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই গবেষণা পত্রের সপ্তম অধ্যায়টি হবে গবেষণার সিদ্ধান্ত। যেখানে অপ্রমাণবাদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণবাদী নৈয়ায়িকেরা যেসমস্ত যুক্তি প্রদান করেছিলেন সেই সমস্ত যুক্তিগুলিকে গবেষক তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য জ্ঞানের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন। এছাড়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সংশয়বাদের সদর্থক এবং নঞর্থক ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশয়বাদের সীমারেখা নিরূপণ

২.১. সংশয়বাদ এবং তার বিভিন্ন অর্থ

আক্ষরিক অর্থে 'সংশয়বাদ' বলতে এমন এক ধরনের অবস্থানকে বোঝায় যেখানে চিরাচরিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, মতামত অথবা বিশ্বাস যেগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সকলের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত সেগুলির বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে। দর্শনের জগতে সংশয়বাদ আবির্ভূত হয়েছিল ত্রাস হিসাবে। এটি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক অনুসন্ধানের ত্রাস নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতারও প্রতিবন্ধক। যদি সবকিছুই ভ্রান্ত এবং অনিশ্চিত হয় তাহলে সত্য বা নিশ্চয়তার অনুসন্ধান অর্থহীন হয়ে যায়। যদি কোনও সার্বিক নৈতিক নিয়ম বলে কিছু না থাকে তাহলে নৈতিক ক্রিয়াকর্ম অনর্থক হয়ে পরবে। সংশয়বাদের এই উত্থান দার্শনিকদের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে পরে। তাঁরা ভাবতে থাকেন কীভাবে এই সংশয়বাদের মোকাবিলা করা যায়। দার্শনিকরা মনে করেন সংশয়বাদীদের পথ অনুসরণ করে তাঁদের মোকাবিলা করা যথাযথ হবে নাকি ভিন্ন উপায়ে মোকাবিলা করা শ্রেয়। অর্থাৎ সংশয়বাদ কোথাও একটু হলেও দার্শনিকদের কপালে ভাঁজ ফেলেছিল। ফলস্বরূপ সকল জ্ঞানতাত্ত্বিকদের অন্যতম একটি কাজ হয়ে পরে সংশয়বাদের অগ্রগতি রোধ করে সংশয়বাদের মোকাবিলা করা। এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে সংশয়বাদ কি আদৌও সমর্থনযোগ্য অথবা সমর্থনযোগ্য নয়? এরূপ প্রশ্নের উত্তর যদি নঞর্থক হয়, তাহলে পুনরায় প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে সংশয়বাদের মোকাবিলা করার জন্য আদৌও কি দার্শনিকদের পর্যাপ্ত যুক্তি প্রস্তুত

আছে? এরূপ প্রশ্নগুলির বিচারের পূর্বে আমাদের জানা দরকার প্রকৃতপক্ষে সংশয়বাদ বলতে ঠিক কী বোঝায়? দৈনন্দিন জীবনে ‘সংশয়’ এবং ‘সংশয়বাদ’ অভিধাটি খুবই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। একজন দুষ্টু ছেলে যে কিনা তার পিতা মাতার কথাতে বিশ্বাস করে না, তাকে প্রায়শই তিরস্কৃত হতে হয় অবিশ্বাসী অথবা সংশয়ী হিসাবে। আবার একজন স্বামী তার স্ত্রীকে প্রায়শই সংশয়ী বলে দোষারোপ করেন। কারণ সে তার স্বামীর দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপকেই সন্দেহ করে। কোনও ব্যক্তি যদি সমাজের কিছু প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে প্রশ্নাতীতভাবে অথবা নির্বিচারে মানতে অস্বীকার করেন তাহলে তিনি সমাজে সংশয়বাদের প্রচারক হিসাবে গণ্য হন। অধিকাংশ সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে লক্ষ করা যায় যে, তাঁরা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান এগুলিকে স্বাভাবিক ঘটনা বা সামাজিক ঘটনা অথবা মানসিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেন। এই ধরনের ব্যক্তিগণ সাধারণত কোনও অতিবর্তী সত্তা অথবা ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাস করেন না। আর এমন ধর্মীয় রীতিনীতিতে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিকে সমাজে প্রায়শই সংশয়ী হিসাবে অবহেলিত হতে দেখা যায়। আবার কোনও হতাশাগ্রস্থ ব্যক্তি যে কিনা তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান তাকেও সংশয়বাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং এগুলি থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে ‘সংশয়ী’ (sceptic) শব্দটিকে প্রায়শই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়।

দর্শন সাহিত্যে প্রায়শই ‘sceptic’, ‘sceptical’ এবং ‘scepticism’ শব্দগুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু এদের কোনও একটির অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় না। এছাড়া ‘সংশয়বাদ’ (scepticism) শব্দটির কোনও সর্বজনগৃহীত লক্ষণ লক্ষ্য করা যায় না। তাই সংশয়বাদের সর্বজনগৃহীত লক্ষণ আদৌও কি দেওয়া সম্ভব? এটি

আলোচনার পূর্বে তার আক্ষরিক অর্থ কি সেটা জানা জরুরী। ‘সংশয়বাদ’ (scepticism) শব্দটি গ্রীক শব্দ ‘skeptomai’ শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়। যার অর্থ হল চিন্তা ভাবনা করা, বিবেচনা করা। আবার ‘সংশয়ী’ (skeptic) এবং ‘সংশয়বাদ’ (skepticism) শব্দগুলি ‘skeptikos’ শব্দটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে সাধারণত দাবী করা হয়।[1] যার অর্থ হল অনুসন্ধান করা। সংশয়ী বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি সর্বদা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে নানা সাফল্য অর্জন করি সেগুলির অনুসন্ধান করেন। এছাড়া তিনি জ্ঞান বলে কি আদৌও কোনও কিছু থাকা সম্ভব তার অনুসন্ধান করেন। আর তাই ‘সংশয়বাদ’ এর লক্ষণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এটি এমন এক ধরনের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক অবস্থান যা দর্শনশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের যাথার্থ্যতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে।[2] সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সংশয়বাদ হল এমন এক ধরনের অবস্থান যা কিনা জ্ঞানের দাবীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন ও আপত্তি তোলে। আর সংশয়ী হল এমন একজন ব্যক্তি যে কিনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানের দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন।

Arne Naess তাঁর ‘Skepticism’ নামক গ্রন্থে বলেন যে ব্যাপকতা (comprehensiveness), তীব্রতা (intensity), স্বপ্রসঙ্গ (self reference) এবং স্পষ্টতা (articulateness) এই চারটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংশয়বাদকে দেখা যেতে পারে। সংশয়বাদকে আমরা ধর্মীয়, নৈতিক অথবা জ্ঞান তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পেয়ে থাকি।

---

[1] Edwards, Paul. Ed. (1967).*The Encyclopedia of Philosophy*. Vol- VII. London:Collier Macmillan Publishers. P-449.
[2] Rescher, Nicholas. (1980). *Scepticism – A critical reappraisal*. Oxford: Basil Blackwell. P-XI.

কিন্তু সংশয়বাদের একটি অর্থ সার্বিক সংশয়কে সূচীত করে। আর এই সার্বিক সংশয়ই দার্শনিক সংশয় হিসাবে সুপরিচিত। এই দার্শনিক সংশয় সকল ক্ষেত্রেই বিশেষত জ্ঞানোৎপত্তির অথবা বৌদ্ধিক চিন্তা ভাবনার তীব্র বিরোধিতা করে।[3] এই সংশয়বাদের প্রবক্তা হলেন পাইরো। সংশয়বাদকে তীব্রতার (intensity) দিক থেকে আলোচনা করা হয়ে থাকে।[4] একজন ব্যক্তি যিনি কম সম্ভাব্য এবং বেশি সম্ভাব্যের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন কিন্তু সম্ভাব্য থেকে সত্যতাকে অথবা সম্ভাব্য থেকে মিথ্যাত্বের পার্থক্য করতে নারাজ এমন ব্যক্তিকে সংশয়বাদী হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার প্রায়শই এমন ব্যক্তিকে সংশয়বাদী বলা হয় যিনি কখনই সম্ভাব্যতার তারতম্যকে স্বীকার করেন না। সংশয়বাদীর দাবী যে কোনও কিছুই হতে পারে। একজন সংশয়বাদী তাঁর নিজের অবস্থানকে বাদ দিয়ে যাবতীয় সবকিছুকে সংশয়যোগ্য বলে মনে করেন। যখন একজন সংশয়বাদী বলেন যে কোনও কিছু জানা সম্ভব নয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উদ্দ্যেশ্যে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি কি জানেন যে তাঁর পক্ষেও কোনও কিছু জানা সম্ভব নয়? এর উত্তর যদি সদর্থক হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে তাঁর বক্তব্যের পিছনেও কোনও যুক্তি নেই, অর্থাৎ ভিত্তিহীন। আর যেহেতু তাঁর বক্তব্য ভিত্তিহীন সেহেতু তিনি নির্বিচারবাদী (dogmatic) হয়ে পরেন। আর যদি তাঁর উত্তর নঞর্থক হয় (অর্থাৎ বক্তব্যের সপক্ষে আত্মযুক্তি থাকে) তাহলে তাঁকে আর নির্বিচারবাদী বলা যায় না।[5] আবার স্পষ্টতার (articulateness) দিক থেকে সংশয়বাদের মধ্যে তারতম্য লক্ষণীয়।[6] এটা খুবই

[3] Ness, Arne. (1968). *Scepticism*. London: Routledge and Kegan Paul Limited. P-2.

[4] তদেব, পৃ-৩।

[5] তদেব।

[6] তদেব।

প্রত্যাশিত যে একজন দায়িত্বশীল সংশয়বাদী অবশ্যই তাঁর নিজের অবস্থানটিকে স্পষ্ট করবেন। কিন্তু আবার এমনও লক্ষ করা যায় যে এমন অনেক সংশয়বাদী আছেন কখনই তাঁর অবস্থানকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট করেন না। আর এই দুই ধরনের অবস্থানকেই প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে লক্ষ করা যায়।

নির্বিচারবাদের বিরুদ্ধ অবস্থান হল সংশয়বাদ। নির্বিচারবাদ বলতে মূলত বোঝায় সেই মতবাদকে যেখানে কোনোরকম বৌদ্ধিক বিচার বিবেচনা ছাড়াই অতিন্দ্রিয় বস্তুসত্তাতে অথবা যেকোনো অবস্থানের সত্যতাকে স্বীকার করা হয়। পাইরোর মতে একজন নির্বিচারবাদী হলেন এমন ব্যক্তি যে কিনা কিছু অতীন্দ্রিয় সত্তাকে অবৌদ্ধিকভাবে তাঁর নিজের খামখেয়ালী মতো স্বীকার অথবা অস্বীকার করেন। আবার *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে কান্টকে নির্বিচারবাদ (dogmaticism) অভিধাটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। স্পিনোজার দর্শনেও এই ধরনের নির্বিচারবাদের অনুশীলনের কথা বলতে লক্ষ করা যায়। স্পিনোজা প্রাক্স্বীকৃতির সপক্ষে কোনও ধরনের যুক্তিপ্রদান ছাড়াই তাঁর নৈতিকতা থেকে কতকগুলি স্বতঃপ্রমাণিত যুক্তির কথা বলেছিলেন। কিছু চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদীদের আচরণের মধ্যেও নির্বিচারবাদের অনুশীলন লক্ষ করা যায়। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁদের বক্তব্যগুলিকে সত্য বলে দাবী করতেন। বুদ্ধিবাদীরা অভিজ্ঞতায় পাওয়া ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করে বুদ্ধিকেই জ্ঞানের উপায় বলে দাবী করতেন। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদীরা অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলে দাবী করতেন। চরম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম নির্বিচারবাদকে গ্রহণ করে বলেন যে, জ্ঞান কখনই অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না, আর এইভাবে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার অথবা বুদ্ধির উপর পুরোপুরি

প্রাধান্য দেওয়াকে কান্ট নির্বিচারবাদ ছাড়া আর কিছুই বলে মনে করেন না। যেকোনো চিন্তাধারা, মতামতের উপর পুরোপুরি আনুগত্য হওয়া অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের পথে নিছক প্রতিবন্ধক। ফলে এমন অবস্থায় চিন্তন ও তার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন নির্বিচারবাদী কখনই চিন্তন ক্ষেত্রে অথবা ক্রিয়া ক্ষেত্রে কোনও চ্যালেঞ্জ অথবা প্রশ্ন তোলেন না। তিনি কেবলমাত্র কোনও বস্তুর সত্তা বা অসত্তা সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত পোষণ করেন। নির্বিচারবাদীর কাছে তাঁর নিজের অবস্থানের বৈধতা সম্পর্কে অথবা তাঁর জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে কখনও কোনও সংশয় উৎপন্ন হয় না। এছাড়া তিনি প্রকৃত জ্ঞানে পৌঁছানোর সামর্থ্য মানুষের আদৌও আছে কিনা তার অনুসন্ধান করেন না।

অন্যদিকে সংশয়বাদী হলেন এমন একজন যিনি আমাদের সামনে কেবলমাত্র প্রশ্নের উত্থাপনই করেন না, বরং আদৌও মানুষের প্রকৃত জ্ঞানলাভের সামর্থ্য আছে কিনা তারও অনুসন্ধান করেন। একজন সংশয়বাদী সাধারণত জ্ঞানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ইত্যাদি জ্ঞানের মানদণ্ডগুলির নিশ্চয়তা সম্পর্কে সংশয় করেন। সংশয়বাদী নির্বিচারবাদীদের তীব্র বিরোধিতা করেন। কারণ তাঁরা কোনও ধরনের পরীক্ষা অথবা মানদণ্ড ছাড়াই বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানের দাবী করেন। A.J. Ayer সংশয়বাদীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে একজন সংশয়বাদী কখনই দাবী করেন না যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত। বরং তিনি বলেন এগুলি যৌক্তিকভাবে দোষদুষ্ট অথবা যৌক্তিকভাবে প্রশ্নযোগ্য।[7] এছাড়া তিনি আরও বলেন যখন কোনও বাক্যের সত্যতা দাবী করা হয় তখন সেই বাক্যের মধ্যে

[7] Ayer, A. J. (1956). *The Problem of Knowledge*. London: Macmillan. P-39.

কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন- প্রথমত, বাক্যটিকে স্বতঃসিদ্ধ হতে হয়। দ্বিতীয়ত, বাক্যটিকে অভিজ্ঞতালব্ধ হতে হবে। তৃতীয়ত, যে বাক্য থেকে সেটি নিঃসৃত হবে সেই বাক্যের নিশ্চয়তা অথবা আবশ্যিকতা থাকতে হবে।[8] বাক্যের সত্যতাকে অস্বীকার করতে গিয়ে একজন সংশয়বাদী হয় কোনও অবস্থানকে অস্বীকার করবেন অথবা তিনি এমন কোনও বক্তব্য পেশ করবেন যেগুলি যথাযোগ্য নয়। এছাড়া একজন সংশয়বাদী বাক্যের সত্যতাকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলতে পারেন যে আপাততভাবে যেগুলিকে বৈধ বা সত্য বলে মনে হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বৈধ বা সত্য নয়।

২.২. সংশয়বাদের নানা রূপ

সংশয়বাদের বিভিন্ন প্রকার লক্ষ করা যায়। জ্ঞান যেমন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে তেমনি সংশয়বাদও বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।[9] ঘটনামূলক (factual), গঠনমূলক (formal), আদর্শনিষ্ঠ (normative) এবং আধ্যাত্মিক (theological) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান হয়ে থাকে। সকল জ্ঞানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘটনামূলক জ্ঞান। এই জ্ঞান বিশ্বজগতের প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে, অন্যদিকে গঠনমূলক জ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত। আবার যেখানে আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হল কোনো কিছুর ভালো, মন্দ, সৌন্দর্য, কর্তব্য পরায়ণতা ইত্যাদি মুল্যায়ন করা সেখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল অতিপ্রাকৃত সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা।

---

[8] তদেব, পৃ-৪০।

[9] Saha, Sukharanjan. Ed. (1997). *Essays In Indian Philosophy*. Calcutta: Allied Publishers Ltd. In collaboration with Department of Philosophy, Jadavpur University. P-186.

এখন জ্ঞান যেমন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তেমনি জ্ঞানের ন্যায় সংশয়বাদও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন একজন সংশয়বাদী যিনি প্রাকৃতিক ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যের প্রামাণ্যে সংশয় পোষণ করেন তিনি জ্ঞানীয় সংশয়বাদী (cognitive skeptic) হিসাবে পরিচিত। আবার যিনি গণিত এবং যুক্তিবিদ্যার মতো গঠনমূলক বিজ্ঞানের (formal science) নিয়মগুলি আদৌও বিশ্বাসযোগ্য কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁকে গাণিতিক সংশয়বাদী (mathematical skeptic) বলা হয়। আবার যিনি ধর্মতত্ত্ববিদ্ প্রদত্ত বাণী এবং ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত দেবদেবীর স্বরূপ, জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সেগুলিকে নাকচ করেন তিনি হলেন ধার্মিক সংশয়বাদী (religious skeptic)। অন্যদিকে যিনি নৈতিক আচরণের নিয়মনীতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি হলেন নৈতিক সংশয়বাদী (ethical skeptic)। সুতরাং এর থেকে এটা স্পষ্ট যে সংশয়বাদ বলতে কেবল তার সার্বিক রূপকে বা সার্বিক সংশয়কে বোঝায় তা নয় বরং তার আংশিক রূপকে বা আংশিক সংশয়বাদকেও বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু সংশয়বাদের যে রূপটি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে তা হল জ্ঞানীয় সংশয়। আর এই জ্ঞানীয় সংশয়বাদ হল এমন একটি অবস্থা যা প্রকৃত জগত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে মানুষের আদৌও সামর্থ্য আছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করা। একজন জ্ঞানীয় সংশয়বাদী কখনই নৈতিক নিয়ম এবং ধর্মীয় প্রাক্স্বীকৃতিতে সংশয় পোষণ করেন না, বরং এই পার্থিব জগতের ঘটনা এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন। আমরা বাহ্যজগত সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করি সেগুলির বিরোধিতা করেন একজন জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদী (epistemic skeptic)। তিনি আমরা যেসকল প্রাকৃতিক ঘটনার স্বরূপকে নিশ্চয়তার সঙ্গে জানি

সেগুলির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করতে আগ্রহী নন, বরং আমরা যখন প্রকৃত জগতকে অপ্রকৃত বলে জানি তখন তিনি তার বিরোধিতা করেন। আমরা সাধারণত যেসকল দাবী করি এবং তার সপক্ষে যে তথ্যপ্রদান করি সে দুটির মধ্যে ব্যবধান থাকে বলে জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদীরা মনে করেন। তাঁরা জোরপূর্বক বলেন যে আমরা কখনই প্রকৃত জ্ঞানলাভের দাবী করতে পারি না। জ্ঞানীয় সংশয়বাদীরা জ্ঞানতাত্ত্বিকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, বিশেষত যেসকল জ্ঞানতাত্ত্বিকরা জ্ঞানের ধ্রুপদী লক্ষণের কথা বলেন। জ্ঞানের ধ্রুপদী লক্ষণে জ্ঞানকে যুক্তিসিদ্ধ সত্য বিশ্বাস হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।[10] যথার্থ জ্ঞান নিরূপণের ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের সত্যতাতে বিশ্বাসই কেবল পর্যাপ্ত হতে পারে না। কারণ বিশ্বাসকারীকে অবশ্যই তার বিশ্বাসের সপক্ষে উপযুক্ত যুক্তিপ্রদান করতে হবে। A.J. Ayer –এর মতে বিশ্বাসকারীকে অবশ্যই তার বিশ্বাসের প্রতি সুনিশ্চিত হতে হবে।[11] বিশ্বাসকারী প্রদত্ত যুক্তির যাথার্থ্যতার জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত যুক্তিপ্রদান করা প্রয়োজন। আর সেজন্য সংশয়বাদী মনে করেন সত্যতা অথবা নিশ্চয়তা অর্জন করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ফলে আমরা যে জ্ঞানের দাবী করি সেটি কখনই যথাযথ হতে পারে না। সচরাচর সংশয়বাদীরা কোনও বিশেষ বচনকে (particular statement) সত্য অথবা মিথ্যা বলেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন কেউ যখন কোনও একটি বিশেষ বচনকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করেন তখন সেই ব্যক্তি অবশ্যই সেই বিশেষ বচনটিকে সত্য বলে স্বীকার করেন। কোনও বচনকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করার যৌক্তিক অর্থ হল অন্য কোনও বচনকে সত্য বলে স্বীকার করা। আবার কোনোকিছুকে

---

[10] Edwards, Paul. Ed. (1967). *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol- IV. London:Collier Macmillan Publishers. P-345.

[11] Ayer, A. J. (1956). *The Problem of Knowledge*. London: Macmillan. P-35.

অবিশ্বাস করার অর্থ অন্যকিছুকে বিশ্বাস করা। সুতরাং একজন প্রকৃত সংশয়বাদী সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে কখনই রাজী নন। এমনকি তিনি কিছু বচনকে মিথ্য বলে বাতিল করতেও আগ্রহী নন। কারণ যেহেতু তাঁর মূল উদ্দেশ্য হল যে কোনও ধরনের জ্ঞানের দাবীকে নস্যাৎ করা সেহেতু তাঁর কোনও প্রয়োজনই নেই বচনের সত্যতা এবং মিথ্যাত্বের, বিশ্বাসযোগ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা।

উপর্যুক্ত জ্ঞানীয় সংশয়বাদ ছাড়া আরও নানাধরনের সংশয়বাদ লক্ষ করা যায়। যেমন চিরাচরিতভাবে তাত্ত্বিক সংশয়বাদ ও প্রায়োগিক সংশয়বাদের মধ্যে বিভাজন লক্ষ করা যায়। তাত্ত্বিক সংশয়বাদ মূলত চিন্তার জগতে অথবা তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এই ধরনের তাত্ত্বিক সংশয়বাদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় হিউম প্রদত্ত সংশয়ের। হিউম মানুষের বোধশক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কারণ মানুষের বোধশক্তি কখনই সম্ভাব্যতার জগতকে অতিক্রম করতে পারে না। ফলে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সব নিশ্চয়তার দাবী করি সেগুলি ভিত্তিহীন। হিউমের মতে সংশয়কে চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, তা কখনও প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ দৈনন্দিন জীবনে মাত্রাতিরিক্ত সংশয়ের প্রয়োগ কঠিন ব্যাধির ন্যায়। তাই যদি আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংশয়ের প্রয়োগ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারি তাহলে আমরা কঠিন ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।[12] তবে হিউমের মতে মৃদু সংশয় রেখে দৈনন্দিন জীবনে পথ চলাটা আখেরে ক্ষতির তুলনায় লাভজনক। হিউম তাঁর *Enquiry* গ্রন্থে পূর্বগ সংশয় (antecedent skepticism) এবং অনুগ সংশয়

[12] Russell, Bertrand. *The History of Western Philosophy*. United State of America: American Book Stratford Press. P-671.

(consequent skepticism) নামক দু'রকম সংশয়ের কথা উল্লেখ করেন। হিউমের মতে পূর্বগ সংশয় হল এমন ধরনের সংশয় যেখানে সকল দার্শনিক তত্ত্ব অথবা কোনও কিছুর অনুসন্ধান সংশয়ের মধ্য দিয়ে সূচীত হয়।[13] আর এই সংশয় কেবলমাত্র আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা, নিয়ম নীতির বিরোধিতাই করে না, বরং আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকেই বিরোধিতা করে। এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত সংশয়বাদের প্রয়োগ যেমনি আমাদের সকল কুসংস্কার এবং প্রাকস্বীকৃতি থেকে মনকে মুক্ত করে তেমনি কোনও কঠিন অবস্থায় আমাদের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করে। আর এই পূর্বগ সংশয়ের মতো আর এক ধরনের সংশয় বিদ্যমান, যা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ নিঃসৃত হয়। আর এই সংশয় আমাদেরকে যেকোনো ধরনের দৃঢ় সংকল্প থেকে বিরত থাকতে শেখায়। হিউমের মতে এই ধরনের সংশয় হল অনুগ সংশয়।

সংশয়বাদের মধ্যে কেবল মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষ করা যায় না, বরং তাদের মধ্যে পরিধিগত পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। আর এই নিরিখেই সার্বিক সংশয়বাদ (global skepticism) এবং আংশিক সংশয়বাদের (local skepticism) মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সার্বিক সংশয়বাদ হল এমন সংশয়বাদ যেখানে কেবলমাত্র কোনও বিশেষ জ্ঞানের দাবিতে সংশয় পোষণ করা হয় তা নয়, বরং সেখানে যে কোনোরকম জ্ঞানের দাবীকে অস্বীকার করা হয়। কখনও কখনও এই ধরনের সংশয়বাদকে দার্শনিক সংশয়বাদ (philosophical skepticism) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একজন দার্শনিক সংশয়বাদী আমাদের জ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে কখনও প্রশ্ন তোলেন না, বরং তিনি

[13] Hume, David. (1748). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. With an introduction J. N. Mohanty. (1999). Calcutta: Progressive publishers. P-119.

জ্ঞানের উৎপত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেন।[14] ফলে প্রত্যক্ষ হয়ে পরে ভ্রান্ত, অনুমান হয়ে পরে অবৈধ এবং সকল শব্দ প্রমাণ হয়ে যায় প্রতারণাপূর্ণ। সহজ কথায় বাহ্যজগত বিষয়ক এবং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বিষয়ক যেকোনো জ্ঞানের দাবী হয়ে যায় অবৈধ। আর এই ধরনের সংশয়বাদকে মাথায় রেখে A.J. Ayer এক ধরনের আংশিক সংশয়বাদের কথা বলেন, যাকে তিনি বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ (scientific skepticism) বলে অভিহিত করেন।[15] একজন বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্পর্কে সংশয় করে থাকেন। তিনি সন্দেহ করেন হস্তগননা কি আদৌও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে? আর এখানেই দার্শনিক সংশয়বাদী এবং বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য লক্ষণীয়। একজন বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদীকে সচরাচর কোনও কিছুর উৎস সম্বন্ধে সেটি বিশ্বাসযোগ্য কিংবা বিশ্বাসযোগ্য নয় সে বিষয়ে পার্থক্য করতে দেখা যায়। কিন্তু এই ধরনের পার্থক্য করতে দার্শনিক সংশয়বাদীকে দেখা যায় না। একজন বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী দাবী করেন যে পরিস্থিতির নিরিখে মানুষের ইন্দ্রিয় প্রতারিত হতে পারে, যেমন যখন কোনও মানুষ অসুস্থতার সম্মুখীন হয়। বিপরীতে দার্শনিক সংশয়বাদী সন্দেহ করেন যে, যেকোনো পরিস্থিতিতে মানুষের ইন্দ্রিয় কি আদৌও যথাযথ তথ্য দিতে সক্ষম? ঘটনাবশত দার্শনিক সংশয়বাদীর এই সংশয় কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধিত নয়। কারণ তিনি সকল অভিজ্ঞতার যাথার্থ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

[14] Ayer, A. J. (1956). *The Problem of Knowledge*. London: Macmillan. P-35.
[15] তদেব।

দার্শনিক সংশয়বাদী জাগতিক বস্তু এবং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বিষয়ে যেসমস্ত বিশ্বাস আমাদের থাকে সেই বিশ্বাসগুলিতে সংশয় পোষণ করেন। কারণ তিনি মনে করেন ওই সমস্ত বিষয়ের বিশ্বাসের পিছনে অনুমান বিদ্যমান, আর অনুমান কখনই যথার্থ নয়, বরং তা অবৈধ ও অসহনীয়। কারণ যখন আমরা কোনও পার্থিব বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান করি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে কিংবা অতীতের কোনও ঘটনার নিরিখে বর্তমানের কোনোকিছু সম্পর্কে অনুমান করি সেটি অবৈধ উপায়ে করে থাকি। দার্শনিক সংশয়বাদী যে যুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমাদের জ্ঞানের দাবীকে নস্যাৎ করেন তা নিম্নরূপঃ[16]

প্রথমত, দার্শনিক সংশয়বাদীরা মনে করেন পার্থিব বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান সেগুলি পরোক্ষ তথা অনুমানস্বরূপ। কারণ ওই সকল জ্ঞানের জন্য আমরা পুরোপুরি যুক্তিবাক্যের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, তাঁরা এটা বলেন যে ওই অনুমানের অবরোহণ ক্ষমতা থাকে না। অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সর্বদা যৌক্তিকভাবে তার আশ্রয়বাক্য থেকে নিঃসৃত হয়। কিন্তু পার্থিব বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয় না। তৃতীয়ত, তাঁরা বলেন যে ওই সমস্ত অনুমানগুলি আরোহ নয়। এটা সত্য যে আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে কোনোকিছুকে পর্যবেক্ষণ করে কোনও অপর্যবেক্ষিত বস্তুর সম্পর্কে অনুমান করা হয়। এমনকি আমরা কিছু দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষন করে কোনোকিছুর সামান্যীকরণ করে থাকি। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সামান্যীকরণ করলেও তা আমাদের কখনই কোনোকিছু সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে না। আর এইভাবেই কোনও অনুমানকে

[16] Ayer, A. J. (1973). *The Central Question of Philosophy*. The Macmillan company of India Ltd. New Delhi. P-65-66.

অবরোহ কিংবা আরোহ হিসাবে ব্যাখ্যা করার অক্ষমতাকে তুলে ধরে সংশয়বাদীরা সিদ্ধান্ত করেন যে আমরা যে জ্ঞানের দাবী করি সেগুলি যেমন ভিত্তিহীন তেমনি অযৌক্তিক।

২.৩. সংশয়বাদের পাশ্চাত্য ধারা

দর্শনের ইতিহাসে সংশয়বাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। দার্শনিক চিন্তার উদয় কিছু মৌল জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে। যেমন যে জগতে আমরা বসবাস করি তার কি কোনও শুরু রয়েছে? যদি থাকে, তাহলে কখন এই জগতের উৎপত্তি হয়েছে? ঐ উৎপত্তির পূর্বে কী ছিল? জগৎ গঠনের মূলে জল, বায়ু, জড়ের মতো কোন প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে নাকি কোনও আধ্যাত্মিক সত্তা জগৎ উৎপত্তির কারণ? কোনও ঐশ্বরিক সত্তা প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে জগৎ গঠন করেছেন এমন দাবি করা যায় কি? মানুষের জ্ঞান কি জগতের রহস্যভেদ করতে সক্ষম? জ্ঞানে বস্তু যেভাবে প্রতিফলিত হয় বস্তু কি স্বরূপত তাই, নাকি অবভাসিত রূপের অন্তরালে তার একটি অবগুণ্ঠিত স্বরূপ আছে। এরকম বহু জিজ্ঞাসা বিরস্বিত করেছে মানব-মনকে, যার পরিণতি হিসাবে উন্মেষ ঘটেছে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নানা তত্ত্বের। কিন্তু ঐসব তত্ত্বের পাশাপাশি বিকাশ ঘটেছে একধরনের সংশয়বাদী সন্দেহের। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি জিজ্ঞাসার আসলে দুটি দিক রয়েছে। ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় প্রতিটি দার্শনিক প্রশ্ন একধরনের বিপ্রতিপত্তিকে[17] সূচিত করে। যার একটা বিধিকোটি রয়েছে এবং রয়েছে একটা নিষেধকোটি। এই জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট কিনা এই জিজ্ঞাসা দুটি

---

[17] *ন্যায়সূত্রভাষ্য* ১/১/২৩, পৃ;২৫৭।

বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিকে সূচিত করে। প্রথমটি, জগৎ ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। দ্বিতীয়টি, জগৎ ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট নয়। এই দুটি পরস্পর বিরোধী বিকল্প সম্ভবনার কোনটি সঠিক এ ব্যাপারে নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না বলে মতপ্রকাশ করেছেন একদল চিন্তাবিদ্। পরিণতি হিসাবে প্রতিটি দার্শনিক জিজ্ঞাসা যেমন একদিকে জন্ম দিয়েছে নতুন নতুন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের, তেমনি পাশাপাশি সৃষ্টি করেছে সংশয়বাদী সন্দেহের। এই সন্দেহবাদী অবস্থানকে যদি একটি মতবাদ হিসাবে ধরা হয় তাহলে তাকে বলতে হয় সংশয়বাদ।

'সংশয়বাদ' (skepticism) কথাটি পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে| পাশ্চাত্য ধারায় সংশয়বাদ বলতে এমন একটি অবস্থানকে বোঝানো হয় যা এককথায় কোনও কিছুকে নিঃসংশয় বলে মেনে নিতে নারাজ। সংশয়বাদের লক্ষণ দিতে গিয়ে সেক্সটাস এম্পিরিকাস বলেছেন, সংশয়বাদ হল একটা ক্ষমতা বা মনোভাব, যা যেকোনও ভাবে, যেকোনও ধরনের অবধারণ গঠনের বা অবধারণের আবির্ভাবের বিরোধিতা করে।[18] সংশয়বাদ এই দাবি রাখে যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। সংশয়বাদের মূলনীতি হল প্রতিটি বচন বা তার সমতুল্য বচনের বিরোধীতা করা এবং এটা দেখানো যে ঐ ধরনের বচনকে মেনে নেওয়া আসলে নির্বিচারবাদের কাছে হার মেনে নেওয়া।[19]

এই সন্দেহ বা সংশয় দর্শনের প্রতিটি অঙ্গনকেই কমবেশি সমস্যায় ফেলেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সংশয়বাদ। অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ধর্মদর্শন, জ্ঞানতত্ত্ব

[18] Sextus Empiricus, *Outlines of Pyrrhonism*, translated by R.G. Bury, Amherst, New York, Prometheus Books, p- 17.

[19] তদেব, পৃ; ১৯।

প্রতিটি শাখাতেই সংশয়বাদের আক্রমণ ঘটেছে। সর্বজনগ্রাহ্য কোনও নীতি যদি না থাকে, তাহলে কোনও পরমতত্ত্ব এবং তার প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সমস্ত নৈতিক আলোচনা অবান্তর হয়ে পড়ে। অবভাসের অন্তরালে বস্তু স্বরূপের রহস্যভেদ করার ক্ষমতা যদি মানব বুদ্ধির না থাকে, তাহলে আধিবিদ্যক আলোচনা হয়ে পড়ে অসার, নিরর্থক বাগাড়ম্বর। ঈশ্বর বা কোনও দৈব সত্তার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব যদি যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহলে সে বিষয়ে আলোচনা তাৎপর্য হারায়। সংশয়বাদী আক্রমণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে জ্ঞানতত্ত্বকে। জগতে যেমন অসংখ্য বস্তু আছে, তেমনি তাদের সম্বন্ধে সত্য এবং নিশ্চিত প্রতীতি লাভ করা সম্ভব - এটাই আমাদের দৈনন্দিন বিশ্বাস। জাগতিক বস্তুগুলো যতখানি বাস্তব, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞানও ঠিক ততখানি বাস্তব বা সত্য বলে আমরা মনে করি। আর পাঁচটা জাগতিক ঘটনার মতোই প্রকৃত জ্ঞান লাভও একটা ঘটনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন না চরম সংশয়বাদীরা। তাঁদের মতে তথাকথিত জ্ঞান এমন একটি ধারণা যাকে না যায় বর্ণনা করা, না যায় তার লক্ষণ দেওয়া। এখন যথার্থ জ্ঞান বলেই যদি কিছু না থাকে, তাহলে সেই জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হিসাবে 'জ্ঞানবিদ্যা' বলে কোনও শাস্ত্র গড়ে উঠবে কীভাবে?[20] কাজেই সংশয়বাদকে মেনে নিলে 'জ্ঞানতত্ত্ব' বলে কিছু থাকে না। তাই পাশ্চাত্য জ্ঞানতাত্ত্বিকদের কাজ হল সংশয়বাদের মোকাবিলা করা। এভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে দেখা দিয়েছে সংশয়বাদের নানা আকার - জ্ঞানতাত্ত্বিক, আধিবিদ্যক, নীতিতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ইত্যাদি। আধুনিক কালের দর্শন সমালোচকেরা আবার ব্যাপ্তি এবং ক্ষেত্র অনুসারে সংশয়বাদের নানা প্রকার বিভাজন করেছেন। সার্বিক ও আংশিক

---

[20] Ayear.A.J, *Central Question of Philosophy*, P- 1.

(wholesale and partial) এইভাবে সংশয়বাদের পরিধি অনুয়ায়ী বিভাজন করেছেন কেউ কেউ। আলোচনার সকল ক্ষেত্রকে গ্রাস করে প্রথম ধরনের সংশয়বাদ। তাই একে চরমপন্থী সংশয়বাদ (absolute skepticism) বলে অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে সংশয়বাদের দ্বিতীয় প্রকারটি সংশয়কে সীমাবদ্ধ করে জ্ঞানের বিশেষ কিছু অঙ্গনে। এধরনের সংশয়কে নরমপন্থী (moderate) বলে অভিহিত করা হয়। কেউ, কেউ আবার দার্শনিক সংশয়বাদ, বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ এই ভাবে সংশয়বাদের বিভাজন পছন্দ করেন। এই বিভাজনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে A.J. Ayer নাম। বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ বলতে তিনি বুঝেছেন সেই সব সংশয়কে যেগুলো জ্ঞানের কোনও না কোনও ক্ষেত্র সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান হতে পারে কিনা, হস্তগননা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাসের কোনও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হতে পারে কিনা ইত্যাদি। মোট কথা জ্ঞানের উৎস গুলিতে এই সংশয়বাদের সমর্থকদের কোনও অনাস্থা নেই। তাঁদের আশঙ্কা জ্ঞানের উপায় গুলির প্রয়োগ যথাযথ কিনা সে বিষয়ে। পক্ষান্তরে দার্শনিক সংশয়বাদ কোনও বিশেষ জ্ঞান অথবা কোনও বিশেষ শাস্ত্রের প্রামাণ্যে সংশয় পোষণ না করে অনাস্থা পোষণ করে জ্ঞানের উৎস গুলির উপর। দার্শনিক সংশয়বাদীদের একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা আমরা কীভাবে আমাদের আদর্শ প্রমাণগুলোকে ব্যবহার করি তা নিয়ে কখনও প্রশ্ন তোলেন না। তাঁরা প্রশ্ন তোলে ঐ প্রচলিত প্রমাণগুলির সম্বন্ধে। যেমন- প্রত্যক্ষের প্রয়োগ কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে নয় সেটি তাদের বিচার্য্য নয়; তাঁদের প্রশ্ন প্রত্যক্ষ আদৌ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হতে পারে কিনা সে বিষয়ে। তাই বলে এই নয় যারা প্রচলিত নিয়ম কানুন সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা সকলে সংশয়বাদী। যেমন- এক সময় কোনও কাজে হাত

দেওয়ার আগে সেই কাজের ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ধারণের জন্য পাখির অন্ত্র পরীক্ষা করে দেখার রেওয়াজ ছিল। এরকম প্রথা আদৌ গ্রহনযোগ্য কিনা সে সম্বন্ধে যিনি সংশয় পোষণ করেন তিনি এমন কিছু মানদণ্ডকে মেনে নেন যেগুলি নিঃসংশয়। কাজেই তার সংশয় বৈজ্ঞানিক সংশয়। কিন্তু একজন দার্শনিক সংশয়বাদীর সংশয় কোনও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সংশয় নয়। এই সংশয় সকল অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানের সকল উৎসে। জ্ঞানের যাবতীয় উৎসে সংশয় পোষণ করেন একজন দার্শনিক সংশয়বাদী। দার্শনিক সংশয়বাদী দাবি করে প্রত্যক্ষ মাত্রই ভ্রমাত্মক, অনুমান মাত্রই অবৈধ, অন্যের বাক্য মাত্রই প্রতারণাপূর্ণ।[21]

পাশ্চাত্য দর্শনে এই সংশয়বাদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে গ্রীসে। যদিও সংগঠিত কোনও সংশয়বাদ সোফিস্টরা প্রতিষ্ঠা করেননি, তথাপি সংশয়বাদের মূল সুরটি প্রথম ধ্বণিত হয় প্রাচীন গ্রীসের এই প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই সোফিস্টদের (sophist) প্রতিনিধি হিসাবে যার নাম সুবিধিত তিনি হলেন প্রোটাগোরাস। ‘মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি’[22] একথা ঘোষণা করে একদিকে যেমন তিনি জ্ঞানের আপেক্ষিকতা বা জ্ঞাতৃ সাপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি সর্বনিরপেক্ষ বস্তুগত নিশ্চিত জ্ঞানের পথটিও রুদ্ধ করেন। প্রত্যক প্রত্যেক ব্যক্তি যদি পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক পৃথক বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে এবং দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে বস্তু সম্বন্ধে কোনও সর্বসম্মত সংশয়াতীত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। প্রোটাগোরাস দেখান যাকে আমরা সংবেদন বলি তা আসলে পরমাণু সমূহের অবিরাম

[21] Ayer A.J, *The Problem of Knowledge*, P- 36-37.
[22] J. Barnes, *The Pre-Socratic Philosophy*, P- 239.

গতিশীলতার কারণেই ঘটে। আর যা অবিরাম প্রবাহের মধ্যে রয়েছে তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ এমন কোনও কিছুই নেই যা পরপর দুটি মুহূর্তে এক রকম থাকে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে স্বরূপত এক বলে কোনও কিছুই থাকতে পারে না, এবং এক বস্তুর প্রত্যক্ষ হতে পারে না।[23] প্রোটাগোরাস ও সোফিস্টরা নঞর্থক ভাবে যে সংশয়বাদের পথ প্রশস্ত করেন, তাকে একটি সদর্থক মতবাদে রূপ দেন প্লেটো পূর্ববর্তী গ্রীক চিন্তাবিদ জর্জিয়াস (৩৬০-২৭০BCE)। জর্জিয়াস তার নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে একদিকে জেনোর যুক্তির সাহায্য নিয়েছেন অন্য দিকে প্রোটাগোরাসীয় জ্ঞানতত্ত্বের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছেন। জর্জিয়াস একটি গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম *On the Non Existent or On Nature* এই গ্রন্থে তিনি নিজের বক্তব্যকে তিনটি পর্যায়ে উপস্থাপন করেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি দেখান যে কোনও কিছুই নেই (There is nothing)। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখান এমনকি কোনও কিছু যদি থাকেও তাকে জানা যেতে পারে না। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি দাবি করেন, কোনও বিষয় সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান যদি সম্ভব হয়ও তথাপি তা অন্য কাউকে জানানো যেতে পারে না।[24] প্রথম দাবিটি প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি জেনোর পথ ধরেন। তাঁর যুক্তি, কোনও কিছু যদি থাকে তাহলে তা প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞাত হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ আমাদের বস্তুর গতি ও বহুত্বের জ্ঞান দেয়। কিন্তু জেনো দেখিয়েছেন যে গতি ও বহুত্বের ধারণা স্ববিরোধযুক্ত এবং সে কারণে ভ্রান্ত। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কোন কিছু অস্তিত্বশীল হতে পারে না। জেনো তার যুক্তি প্রয়োগ করে বাহ্যশূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা করলেও আন্তরতত্ত্ব হিসাবে পারমেনাইদিসের “Being” কে মেনে নিয়েছিলেন। এখানে

[23] Y.Mashi, *A Critical History of Western Philosophy*, P- 52.
[24] Y.Mashi, *A Critical History of Western Philosophy*, P- 34-36.

জর্জিয়াসের বক্তব্য হল, যে যুক্তি বাহ্যশূন্যতা প্রমাণ করে সেই একই যুক্তি সর্বশূন্যতা প্রমাণ করে। জর্জিয়াসের দ্বিতীয় দাবি ছিল এই যে, কোনও কিছু যদি থাকেও তাকে জানা যেতে পারে না। এই দাবির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে জর্জিয়াস প্রোটাগোরাসের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। এ কথা প্রোটাগোরাস প্রমাণ করেছিলেন যে প্রত্যক্ষ আসলে প্রত্যক্ষকর্তা এবং প্রত্যক্ষিত বিষয় এদের যুগ্ম ফল। কাজেই যা প্রত্যক্ষিত হয় তাকে পুরোপুরি 'বাহ্যবস্তু' বলা যায় না (যে কথা কান্ট পরে বলেছেন); আবার পুরোপুরি মনের ক্রিয়া বলেও তাকে গণ্য করা যায় না (যে কথা পরে ম্যুর বলেছেন)। সুতরাং স্বরূপত বস্তু কেমন তা আমরা কখনও জানতে পারি না। এমতাবস্থায় কোনও উদ্দেশ্যের উপর কোনও বিধেয় আরোপ করা যায় না, বা এমন কথা বলতে হয় যে সম্ভবত সব বচনই মিথ্যা। জর্জিয়াসের তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল আমরা যদি কোনও কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারিও তথাপি অন্যদের তা জানাতে পারি না। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হল বস্তু এবং জ্ঞান পরস্পর থেকে পৃথক। তাই আমাদের জ্ঞান তা সে যাকিছু সম্বন্ধেই হোক, বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান হতে পারে না। এমতাবস্থায় অন্যকে জানানোর জন্য কোনও জ্ঞানই থাকে না।

সংশয়বাদকে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঐতিহাসিকভাবে জড়িত পাইরোর[25] নামের সঙ্গে। এলিসের এই চিন্তাবিদের সময়কাল খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৩৬০-২৭০। এই পাইরোকে অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে গ্রহণ করে অ্যানিসিডেমাস প্রতিষ্ঠা করেন পাইরোবাদী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা এটা প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর ছিলেন যে চূড়ান্ত সত্য এবং চূড়ান্ত মিথ্যা বলে কিছু হয় না। এই পাইরোবাদীদের একদল

[25] Y. Mashi, *A Critical History of Western Philosophy*, P- 133.

ছিলেন প্রায়োগিক সংশয়বাদী, অন্যদল তাত্ত্বিক সংশয়বাদী। পাইরো, অ্যানিসিডেমাস প্রমুখ প্রথম ধরনের সংশয়বাদ সমর্থন করতেন। অন্যদিকে আর্কিনিডিস (Arkenidies) প্রমুখ সমর্থক ছিলেন তাত্ত্বিক সংশয়বাদের। এই তাত্ত্বিক সংশয়বাদীরা মূলত স্টোয়িকদের (Stoick) বিরোধিতা করতেন। এখানে বলা দরকার যে, স্টোয়িকরা কিছুটা ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার বাহক ছিলেন। এঁরা মনে করতেন ইন্দ্রিয়সুখ, নাম, যশ ইত্যাদির মধ্যে মোহাচ্ছন্ন না থেকে মানুষের উচিৎ তার আপনার প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া। এই প্রকৃতি আসলে তার বৌদ্ধিক প্রকৃতি। সমগ্র জগতকে এক বৌদ্ধিক ঐক্য আবদ্ধ বলে স্টোয়িকরা বিশ্বাস করতেন।[26] তাঁরা এও বিশ্বাস করতেন যে বৌদ্ধিক জগতের অংশ হিসাবে মানুষও এক বৌদ্ধিক সত্তা; কাজেই তার উচিৎ নিজের বৌদ্ধিক স্বরূপটিকে উপলব্ধি করা। এরকম চিরায়ত বৌদ্ধিক সত্য অস্বীকার করেন পাইরোবাদীরা। তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে সম্পূর্ণ সত্য বা মিথ্যা বলে কিছু হয় না। অ্যানিসিডেমাস, পাইরো, টিমন, কারনেডিস প্রমুখ গ্রীক চিন্তাবিদগণ যেসব যুক্তির অবতারণা করেন তা একটি সুসংবদ্ধ রূপ পায় সেক্সটাস এম্পিরিকাসের *Outlines Of Pyrrhonism* গ্রন্থে। সেক্সটাস ছিলেন একজন চিকিৎসাবিদ্ এবং দার্শনিক। পাইরোবাদের অন্যতম একজন সমর্থক সেক্সটাস অ্যানিসিডেমাস প্রতিষ্ঠিত নব্য সংশয়বাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সংশয়বাদী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল সদর্থক সমস্ত দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করা এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি তুলে ধরা। দার্শনিকের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করতেন যে মানুষ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম, এবং সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারে। বাহ্যজগত এবং তার সম্বন্ধে যে

[26] Y. Mashi, *A Critical History of Western Philosophy*, P- 118.

ধারণা মানুষ লাভ করে যেগুলোর ভিত্তিতে সে এমন জ্ঞান গঠন করতে পারে যা নিছক মতামত থেকে আলাদা, যা নিশ্চিত ও নিঃসংশয়। ঠিক এর উল্টো কথা বলেন সেক্সটাস ও তাঁর অনুগামীরা। তাদের দাবি হল, জ্ঞান লাভের অযোগ্য অর্থাৎ অলভ্য, অথবা তা লাভের জন্য যেসব শর্ত পূরণ করা দরকার সেগুলো পূরণ করা প্রায় অসম্ভবই। মোট কথা পরিপূর্ণ জ্ঞান বা সুসম্পন্ন জ্ঞান বলে কোনও কিছুই হয় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মন যেসব তথ্য লাভ করে সেগুলি ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। ফলে মানুষের জগতের ধারণা আসলে এক ত্রুটিপূর্ণ ধারণা। যারা দর্পের সঙ্গে এবং গর্বের সঙ্গে সংশয়াতীত জ্ঞানের দাবি রাখেন তাঁদের সঙ্গে প্রায়ই বিবাদে জড়িয়ে পরতেন সেক্সটাস। একজন সংশয়বাদী হিসাবে তাঁর মনে হত যে আমাদের সবরকম নির্ধারণমূলক অবধারণ গঠন থেকে বিরত থাকা উচিত। এটা মনে রাখা উচিত যে কোনও কিছু সম্বন্ধে জ্ঞানের দাবি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিরীক্ষণ, সুগভীর বিশ্লেষণ এবং বিচারমূলক পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে।[27] এই ভাবে সংশয়বাদ ক্রমশ দার্শনিক সংশয়বাদের রূপ লাভ করে। এই দার্শনিক সংশয়বাদ এমন এক প্রকার মতবাদ যা সরাসরিভাবে তথাকথিত জ্ঞান গুলিকে সত্য বা মিথ্যা বলে দাবি করে না বরং ঐ সকল জ্ঞানের সত্যতায় অনাস্থা পোষণ করে। প্রশ্ন তোলে সর্বতোভাবে সুনিশ্চিত কোনও জ্ঞান হতে পারে কিনা? এই দার্শনিক সংশয়বাদ দার্শনিক নির্বিচারবাদের ঠিক বিপরীত। এই নির্বিচারবাদ কিছু বিবৃতিকে একতরফাভাবে সুনিশ্চিত ও সত্য বলে মেনে নেয়। অন্যদিকে দার্শনিক সংশয়বাদ দাবি তোলে হয় কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই অথবা অস্তিত্ব থাকলেও তাদের জানা যায় না। আর যদি কোনও কিছু থাকে এবং তাকে জানা

[27] *Outlines of Pyrrhonism*, P- 7.

যায়ও, তবে অন্য কাউকে তা জানানো যায় না। এরকম দার্শনিক সংশযবাদের প্রকৃত প্রবর্তক বলা চলে জর্জিয়াসকে (৩৬০-২৭০BCE)। পাইরো বা তার অনুগামীদের সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু জানা যায় না। তবে জানা যায় পাইরোবাদীদের মতো অ্যাকাডেমিক্সরাও ছিলেন সংশয়বাদী। তবে জর্জিয়াস যে চরম সংশয়বাদ প্রবর্তন করেন সেই ধরণের সার্বিক অনাস্থাবাদ তাঁর পূর্বে গ্রীক দর্শনে আর পরিলক্ষিত হয়নি। এরকম দার্শনিক সংশয়বাদের অনুগামীরা জ্ঞান বা সত্যতায় তাঁদের অনাস্থার নানা কারণ দর্শিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে সেক্সটাস এম্পিরিকাস তাঁর গ্রন্থে (*Outlines Of Pyrrhonism*) বেশ কিছু যুক্তির অবতারনা করেছেন। যেগুলি তাঁর সমসাময়িক সংশয়বাদীরা সমর্থন করেন বলে দাবি করেন তিনি।

(১) যা কিছু প্রাণীর কাছে সুখকর তা অন্য কিছু প্রাণীর কাছে দুঃখদায়ক। যা একের কাছে প্রয়োজনের তা অন্যের কাছে ক্ষতির বিষয়।

(২) প্রত্যেক মানুষের পৃথক পৃথক পছন্দ, ক্ষমতা ও আগ্রহ রয়েছে।

(৩) একই বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন সংবেদন প্রদান করে।

(৪) এরকম ভাবার কোনও যুক্তি নেই যে আমরা পাপী ও অন্যরা নিষ্পাপ। কারণ ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারে।

(৫) সুন্দর, শুভ, মঙ্গল, ধর্ম, জীবন ও ন্যায় সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে ভিন্ন হয়।

(৬) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও কোনোও ধারাবাহিক সংগতি নেই। একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন রূপে দেখা যায়।

(৭) ইন্দ্রিয়গুলো যে প্রতারণাপূর্ণ তা দেখানো যায়। কেননা দূর থেকে অট্টালিকাকে গোলাকার বলে মনে হয় এবং সূর্যকে মনে হয় ক্ষুদ্র।

(৮) কম পরিমাণে গ্রহণ করলে যা বলদায়ক হয়, তাই অপরিমিত ভাবে গ্রহণ করলে সৃষ্টি করে দুর্বলতা। যেমন- মাদক ও খাদ্য।

(৯) যা খুব বিরল ঘটনা তা মানুষকে অবাক করে, অথচ তা যদি সাধারণ হয় তাহলে মানুষের অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।

(১০) বস্তু সমূহের মধ্যে যে আন্তর সম্বন্ধ, তা একেবারেই আপেক্ষিক এবং সেই কারণেই তা স্বরূপত অজ্ঞেয়। যেমন- পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ। পুত্রকে জানতে গেলেই পিতাকে জানতে হয়, আবার পিতাকে জানতে গেলেই পুত্রকে জানতে হয়।[28]

জর্জিয়াসের সংশয়বাদ এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সব জ্ঞানের সূত্রপাত হয় ইন্দ্রিয় সংবেদনে এবং কোনও সংবেদনই স্থায়ী বা এক রকম থাকে না। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, মুহূর্তে-মুহূর্তে ইন্দ্রিয় সংবেদন বদলে যায়। এই ধরনের সন্দেহবাদকে ‘সাংবেদনিক সংশয়বাদ’ (sensory skepticism) বলা চলে। যাই হোক জ্ঞান যেহেতু সর্বতোভাবে সংবেদন নির্ভর এবং সেই সংবেদন যেহেতু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল তাই এই সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, কোনও কিছু সম্বন্ধে

[28] *Outlines of Pyrrhonism*, P- 27-63.

আমাদের কোনও ধরনের নিশ্চিত জ্ঞান হতে পারে না। এই সাংবেদনিক সংশয়বাদ জর্জিয়াস পরবর্তী অনুগামীদের হাতে আরও সংশোধিত হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদন যেহেতু অবভাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সেই অবভাসের কারণরূপে যেহেতু কোনও কিছুকে জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই একধরনের সার্বিক সম্ভাবনাবাদ (probabilism) অবশিষ্ট থাকে।

তবে গ্রীক দর্শনে সংশয়বাদের জন্ম হলেও গ্রীক সংশয়বাদীরা যে সবাই সব বিষয়ে একমত পোষণ করতেন তা নয়। নিশ্চয়তা এবং জ্ঞান সম্ভব কিনা সে বিষয়ে তাঁরা সকলে অভিন্ন মত ছিলেন না। কেউ কেউ মনে করতেন নিশ্চয়তা যে সম্ভব নয়, সেটা তাঁদের জানা। অন্য একদল আবার বলতেন, জ্ঞান সম্ভব কিনা তা তাঁদের অজানা। আসল ব্যাপার হল যখনই কোনও সংশয়বাদী একথা বলেন যে, জ্ঞান যে অসম্ভব একথা তিনি জানেন তখনই তার মতের উচ্ছেদ হয়ে যায়। অন্য দিকে যখন তিনি বলেন যে, জ্ঞান সম্ভব কিনা তা তিনি জানেন না, তখন জ্ঞানের সম্ভাবনাটি উন্মুক্ত থাকলেও সুনিশ্চয়তায় পৌঁছানো সম্ভব কিনা সেই বিষয়টি সংশয়পূর্ণ থেকে যায়। অধিকাংশ গ্রীক সংশয়বাদী এই দাবি করতেন, যেহেতু কেউ কখনও সুনিশ্চিতভাবে কোনও বিবৃতিকে জানতে পারে না, তাই তাঁর উচিত বস্তু সম্বন্ধে সকল অবধারণ বা বিবৃতিকে স্থগিত রাখা। সম্পূর্ণ নিশ্চিত সত্যর দাবির বিরুদ্ধে যে আপত্তিটি সবচেয়ে নির্ণায়ক বলে মনে হয় সেটি অনবস্থা এবং চক্রক দোষের আপত্তি। এই আপত্তি অনুসারে যে মানদণ্ডের নিরিখে কোন একটি অবধারণকে সত্য বা মিথ্যা বলে রায় দেওয়া হয় সেই মানদণ্ডটি কখনও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। সত্যতার যে মানদণ্ডকে গ্রহণ করে আমরা একটি বিবৃতির সত্যাসত্য নির্ধারণ করি, সেই মানদণ্ডটি যে সত্য তার

নিশ্চয়তা কোথায়? এর উত্তর দিতে গেলে আমাদের দ্বিতীয় একটি মানদণ্ড স্বীকার করতে হয়। আবার দ্বিতীয় মানদণ্ডটির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে গেলে তৃতীয় একটি মানদণ্ডের আশ্রয় নিতে হয়। ফলে একধরনের অনবস্থা অনিবার্য হয়ে পরে। এই ভাবে সত্যতার যে কোনও মানদণ্ডই অন্য মানদণ্ডের উপর নির্ভর হয়ে পরে এবং ফলস্বরূপ সত্যতা নির্ধারণ সম্ভব হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সংশয়বাদ ও বৈতণ্ডিক প্রসঙ্গ

৩.১. বৈতণ্ডিক প্রস্থানের রূপ নির্ণয়

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সংশয়বাদী ধারার অগ্রগতি লক্ষনীয়। যদিও ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে 'scepticism' এর কোনও পর্যায় শব্দ লক্ষ করা যায় না তথাপি কিছু দার্শনিক সম্প্রদায়কে বোঝাতে এই শব্দটিকে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় যারা সর্বদা অন্যের মতের ভুল ভ্রান্তি তুলে ধরতে তৎপর। আর এরকম পরপক্ষ প্রতিষেধকারীরা হলেন বৈতণ্ডিক। শ্রীহর্ষ তাঁর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্' গ্রন্থে 'বৈতণ্ডিক' অভিধাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চার্বাক, মাধ্যমিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন 'বৈতণ্ডিক' হল মূলত তারাই যারা প্রমার প্রামাণ্যে আস্থাশীল নয়।[1] 'বৈতণ্ডিক' শব্দটিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে 'বিতণ্ডা' বলতে ঠিক কী বোঝায় তা জানা দরকার। কারণ 'বৈতণ্ডিক' শব্দটি 'বিতণ্ডা' শব্দ থেকে নিঃসৃত হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে 'বিতণ্ডা' বলতে কী বোঝায় তা জানা জরুরী। সাধারণত 'বিতণ্ডা' বলতে বোঝায় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে বাদানুবাদ। কিন্তু সাধারণভাবে 'বিতণ্ডা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তা কিছুটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'বিতণ্ডা' শব্দটির যথাযথ অর্থ অনুধাবনের জন্য

---

[1] শ্রীহর্ষ, *খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্*, মহামহোপাধ্যায় শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য তর্কবেদান্ততীর্থ অনুবাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, কলকাতা – ৭০০০২৯, পৃঃ-৬।

ন্যায় দর্শনে শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা লক্ষণীয়। নৈয়ায়িকরা 'বিতণ্ডা' বলতে বুঝিয়েছেন যে যখন জিগীষু প্রতিবাদী নিজের কোনও পক্ষ স্থাপন না করে কেবল বাদীর পক্ষ খণ্ডনের জন্য যে সকল বিচারবাক্য প্রয়োগ করেন। আর যিনি বিতণ্ডা নামক বিচার করেন তাঁকে বৈতণ্ডিক বলা হয়।

যে বাদানুবাদ বা তর্কের মাধ্যমে বস্তুর স্বরূপ স্পষ্ট করা হয় সাধারণত তাকে 'কথা' হিসাবে বোঝা হয়। যদিও কখনও কখনও 'কথা' অভিধাটি দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীকে নির্দেশ করা হয় তথাপি ন্যায়দর্শনে 'কথা' বলতে বোঝায় কথোপকথন বা বাদানুবাদকে। একাধিক ব্যক্তি অথবা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তা হল 'কথা'। এই 'কথা' বলতে মূলত বিচারস্থলকে বোঝায়। আর এই বিচারস্থলে যে বা যাঁরা কোনও তত্ত্ব বা মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন তাঁদেরকে বলা হয় বাদী। আর যে বা যারা বাদীর মত বা তত্ত্বের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাঁদেরকে বলা হয় প্রতিবাদী। বাদী এবং প্রতিবাদী তাঁরা তাঁদের নিজেদের অবস্থানকে অটুট রাখার জন্য একে অপরের মধ্যে যে বক্তব্য পেশ করেন সেই বক্তব্যসমূহকে 'কথা' বলা হয়। যদিও বিতর্কের পিছনে কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে তথাপি এই আলোচনা পদ্ধতিটি কিছু নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। আর এখানেই দৈনন্দিন জীবনে একে অপরের মধ্যে শব্দের সাধারণ আদান-প্রদান থেকে কথার পার্থক্য। সাধারন বাদানুবাদের ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের কোনও নিয়ম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু কথার ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। বাচস্পতি মিশ্রের মতে, 'কথা' হল একই বস্তু সম্বন্ধে একাধিক বক্তার উক্তিসমূহ, যেখানে কিছু নিয়ম নীতি অনুসরণ

করতে হয়।[2] কথাতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের উক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম নীতি বজায় রাখা আবশ্যিক। নিয়ম নীতি মেনে যুক্তি প্রদান করাই হল কথার প্রকৃত অর্থ। সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কথা হল সুশীল ব্যক্তিগণের যুক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি। এর মধ্যে এক প্রকার হল বাদ। বাদ বলতে বোঝায় কোনোরকম জয়লাভের প্রত্যাশা ছাড়াই বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করা। কিন্তু অধিকাংশ বাদানুবাদের ক্ষেত্রেই প্রতিবাদীকে পরাজিত করে জয়লাভের আকাঙ্খা লক্ষ করা যায়। যদিও এই ধরণের বাদানুবাদ কথা হওয়ায় যৌক্তিক নিয়ম নীতি লক্ষ করা যায়। প্রতিবাদীকে পরাজিত করে জয়লাভের উদ্দেশ্যে যে বাদানুবাদ (বাদ) তাকে বলে জল্প। এক্ষেত্রে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েরই উদ্দেশ্য হল জয়লাভের মাধ্যমে স্বমত প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে বিতণ্ডা বলতে বোঝায় নিজের মত স্থাপনের উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল অন্যের মতকে খণ্ডন করা। এখন বাদ, জল্প, বিতণ্ডা *কথার* এই তিনটি প্রকারকে স্পষ্টভাবে জানার জন্য তাদের লক্ষণের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার।

বাদ হল একধরণের কথা। ন্যায়সূত্রে মহর্ষি গৌতম বাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যেখানে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা পঞ্চাবয়ব ন্যায় প্রয়োগ পূর্বক পক্ষ (বাদী) ও প্রতিপক্ষর (প্রতিবাদী) সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ বাক্যে পরিগ্রহ হল বাদ।[3] এই লক্ষণটির মধ্যে একাধিক খণ্ডবাক্য বিদ্যমান। প্রথমত, বাদ হল বাদী এবং প্রতিবাদী

---

[2] '...নানাপ্রবক্তৃকবিচারবিষয়া বাক্যসমৃদ্ধিং কথেটি সামান্যলক্ষণম্...' বাচস্পতি মিশ্র, *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটিকা*, অনুবাদক অনন্তলাল ঠাকুর। (১৯৯৬), নিউ দিল্লিঃ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলজফিকাল রিসার্চ। পৃঃ- ৬০৯।

[3] 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ' – *ন্যায়সূত্র* – ১.২.১।

কর্তৃক বাক্য প্রদান। এই বাক্যগুলি বাদী প্রতিবাদী যেমন সপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করেন তেমনি পরপক্ষ প্রতিষেধের জন্যেও প্রয়োগ করেন। এখানে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে কোনও একজন অপরের মতের বিরুদ্ধে যদি প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, 'ক' নামক ধর্মীতে 'খ' নামক ধর্ম বিদ্যমান তাহলে অপরজন সেটিকে খণ্ডন করতে থাকেন। দ্বিতীয়ত, বাদী কর্তৃক উত্থাপিত বাক্যকে প্রতিবাদী যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা (সাধনা) করতে চেষ্টা করেন এবং প্রতিবাদী খণ্ডন (উপলম্ভ) করতে চেষ্টা করেন। বাৎস্যায়নের মতে সাধনা হল বাদীর সপক্ষে যুক্তি। অন্যদিকে উপলম্ভ হল প্রতিবাদীর খণ্ডন বা সমালচনা। যদিও এই বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। তৃতীয়ত, বাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ এবং তর্কের উপর নির্ভর করেই স্বমত স্থাপন এবং পরমত খণ্ডন করা হয়। এখানেই বাদ এবং কথার অন্য দুটি রূপের (জল্প ও বিতণ্ডা) মধ্যে পার্থক্য। জল্প ও বিতণ্ডা উভয় ক্ষেত্রেই স্বমত স্থাপন এবং পর মত খণ্ডন করা হলেও সেখানে প্রমাণ এবং তর্কের প্রাধান্য থাকে না। জল্প ও বিতণ্ডার ক্ষেত্রে ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের মতো অসৎ উত্তরের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বাদে প্রমাণ ও তর্কের উপর নির্ভর করে আলোচনা করা হয়।

অন্যদিকে জল্পও একধরনের বাদানুবাদ, যেখানে বাদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তবে জল্পের ক্ষেত্রে খণ্ডন এবং মণ্ডন করা হয় ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের উপর নির্ভর করে।[4] তবে এখানে একটি প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, মূলত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান অবলম্বন করে কেমনভাবে স্বপক্ষ অবলম্বন করা সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আলোচনা স্থলে বাদী মূলত নঞর্থক ভূমিকা পালন করে প্রতিবাদীর

[4] 'যথোক্তোপপন্নশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ'- *ন্যায়সূত্র* – ১.২.২।

দুর্বলতা এবং অসঙ্গতিকে তুলে ধরেন। যেমন ছলের ক্ষেত্রে বাদীর প্রস্তাবিত বিবৃতিটিকে প্রতিবাদী ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে তার খণ্ডন করেন।[5] অন্যদিকে জাতিও ছলের ন্যায় একই উদ্দেশ্য সাধন করে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের মাধ্যমে।[6] নিগ্রহস্থান হল যার দ্বারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি হয়।[7] এখন প্রশ্ন হতে পারে কীভাবে ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান এরা কোনও তত্ত্ব স্থাপন করবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান যেমন অপরোক্ষ ভাবে খণ্ডন বা সমালোচনার সঙ্গে সম্বন্ধিত তেমনি এগুলি পরোক্ষভাবে মণ্ডনের সঙ্গে সম্বন্ধিত। যেমন রাস্তা দিয়ে ভালোভাবে হাঁটার জন্য সাপ, কাঁটা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকের অপসারণের প্রয়োজন হয় তেমনি একইভাবে সমালোচনা, নিন্দা, বিতর্ক ইত্যাদি যে কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পথকে সুদৃঢ় করে। আর এইভাবে বাদী ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের মাধ্যমে প্রতিবাদীর তত্ত্বের খণ্ডন করে তার নিজের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান বহুক্ষেত্রে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। যদিও মহর্ষি গৌতমের বক্তব্য থেকে এমনটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, ছল ইত্যাদি কোনও কিছুর খণ্ডনের পক্ষে ভূমিকা আছে। বরং ভাষ্য থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, ছল ইত্যাদির মধ্যেও অপরোক্ষভাবে কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্য আছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, সূত্রের যে অভিপ্রায় সেটি সূত্রকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বাৎস্যায়ন বলেন, ছল ইত্যাদি প্রমাণ এবং তর্ক ছাড়া অপরোক্ষভাবে বা স্বাধীনভাবে কখনই কোনও তত্ত্ব গঠন বা স্থাপন করতে পারে না।

---

[5] 'বচনবিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং' – *ন্যায়সূত্র* – ১.২.১০।

[6] 'সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি'-*ন্যায়সূত্র*-১.২.১৮।

[7] 'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং'-*ন্যায়সূত্র*-১.২.১৯।

কারণ সমর্থন এবং বিরোধিতা, স্থাপন এবং খণ্ডন এগুলির কোনোটাই প্রমাণ ছাড়া সম্ভব নয়। অপরদিকে, বিচারস্থলে ছল ইত্যাদি তত্ত্বকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে সহকারী হিসাবে কাজ করে থাকে। সুতরাং ছল ইত্যাদি অপরোক্ষভাবে বা স্বাধীনভাবে সমালোচনা বা নিন্দা করতে পারলেও কখনই তারা অপরোক্ষভাবে কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

তৃতীয় প্রকার বিতর্ক (কথা) হল বিতণ্ডা। যার আলোচনা এই গবেষণার প্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহর্ষি গৌতম বিতণ্ডার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে জল্পের উল্লেখ করেন। যে বিতর্ককে জল্প বলা হয় সেই জল্প নামক বিতর্কটি আবার বিতণ্ডা হয়ে যায় যখন সেখানে প্রতিবাদীর তত্ত্ব বলে কিছু থাকে না।[৪] বিতণ্ডা এমন এক ধরনের বাদানুবাদ যেখানে সরাসরি প্রতিবাদীর মতকে খণ্ডন করা হয়। যেকোনো বিতর্কের ক্ষেত্রে দুটি বিরোধী অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। আর এক্ষেত্রে বাদীর যে অবস্থান তা পক্ষ হিসাবে পরিচিত, আর প্রতিবাদীর অবস্থানটি প্রতিপক্ষ হিসাবে পরিচিত। সাধারণত বাদী এবং প্রতিবাদী একে অপরের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং অন্যের অবস্থানটিকে খণ্ডন করার জন্য যুক্তি প্রতিযুক্তির প্রয়োগ করে থাকেন। বিতণ্ডার ক্ষেত্রে প্রতিবাদী কেবলমাত্র বাদীর মতটিকে খণ্ডনই করেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের অবস্থানটিকে কখনই স্পষ্ট করেন না। এমনকি তিনি সপক্ষ রক্ষার স্বার্থে নিজের অবস্থানকে কখনও উল্লেখও করেন না। আর এই ধরনের বাদানুবাদকে বিতণ্ডা বলা হয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অভিপ্রায়টি সম্পর্কে পাঠকের বিপথে চালিত হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। কারণ প্রথমত, কেউ ভাবতে পারে যে বিতণ্ডায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি তাঁর

[৪] 'স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা'-*ন্যায়সূত্র*-১.২.৩।

অবস্থানকে রক্ষার স্বার্থে কিছু যুক্তি প্রদান করবে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা দরকার এই বাদানুবাদে অংশগ্রহণকারী (বৈতণ্ডিক) কখনই তাঁর অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করবেন না, বরং তিনি কেবল অন্যের অবস্থানকে খণ্ডনই করবেন। সাধারণত এটা সত্য যে, কোনও অবস্থানকে খণ্ডন করা মানে অন্য একটি অবস্থানকে গ্রহণ করা। সুতরাং এখন স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে, বাদানুবাদে প্রতিবাদীর তাহলে নিজস্ব কোনও অবস্থান আছে কি আদৌও? এর উত্তরে বলা যায় যে, বিতণ্ডার ক্ষেত্রে প্রতিবাদীর নিজের কোনও অবস্থান বলে কিছু থাকে না। দ্বিতীয়ত, আবার কেউ বলতে পারেন বিতণ্ডা হল এমন এক ধরনের বাদানুবাদ যেখানে নাকি আদৌও প্রতিবাদীর কোনও বক্তব্যই থাকে না। এক্ষেত্রে বলা যায় বিতণ্ডার ক্ষেত্রটি এমন নয়। কারণ এখানে যদিও প্রতিবাদী তাঁর নিজের অবস্থানের সপক্ষে কিছু বলেন না তবে তিনি বাদীর বক্তব্যের নিরিখেই তাঁদের খণ্ডন করতে গিয়ে বক্তব্য পেশ করে থাকেন। আর এই বিতণ্ডা যারা করেন তাদেরকে বলা হয় বৈতণ্ডিক।

৩.২. বিশিষ্ট বৈতণ্ডিক হিসাবে সঞ্জয়, নাগার্জুন ও শ্রীহর্ষ

ভারতীয় দর্শনে বুদ্ধদেবের দর্শনের পূর্বে সঞ্জয় নামে আর একজন দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি বৈতণ্ডিকদের ন্যায় নিজে কোনও মত প্রদান না করে সর্বদা অন্যের মত খণ্ডনে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তবে অন্যের মত খণ্ডনের নিরিখে আদৌ তাঁর কোনও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিনা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। জয়রাশির ক্ষেত্রে কম-বেশি হলেও এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তিনি কোনও ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৈতিক এবং আধিবিদ্যক তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন না।

ভারতীয় দর্শনে আর একজন অন্যতম অজড়বাদী দার্শনিককে বৈতণ্ডিক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যিনি হলেন *খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্* -এর রচয়িতা শ্রীহর্ষ। তিনি ছিলেন আবার অন্যতম একজন বেদান্তী। তাঁকে বৈতণ্ডিক হিসাবে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে *খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্* গ্রন্থের ভূমিকা রয়েছে। আবার মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন বৈতণ্ডিক হিসাবে ভারতীয় দর্শনে সুপরিচিত। মাধ্যমিকরা মূলত শূন্যবাদী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। অধিবদ্যক প্রশ্নের প্রতি বুদ্ধদেবের নীরব থাকাকে পাথেয় (প্রাক্স্বীকৃতি) করে মাধ্যমিকরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কোনও বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কোনও কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণযোগ্য নয়। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে নাগার্জুনের হাত ধরে পরিণত রূপ লাভ করে। নাগার্জুন তাঁর লেখনির দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠা করেন যে, 'সব কিছু শূন্য' কারণ বস্তুগুলি স্বরূপগতভাবে স্বভাব শূন্য। এই শূন্যতা তত্ত্ব সর্বশূন্যতাকে অথবা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত ঘট পটের মতো বস্তুগুলিকে অস্বীকারের নির্দেশক নয়। বরং এই শূন্যতা তত্ত্ব ঘট পটের মতো বস্তুগুলির স্বভাবশূন্যতার কথা বলে। ঘট পটের মতো বস্তুগুলিকে সৎ বলা যায় না, কারণ সেগুলি অন্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল। আবার এগুলিকে আকাশ কুসুমের মতো অসৎ বলা যায় না। কারণ এগুলি উৎপত্তিযোগ্য। এগুলিকে আবার সদাসৎ ও বলা যায় না। কারণ সদাসৎ একে অপরের বিরুদ্ধ। তাই যা সৎ হয় তা অসৎ হতে পারে না, আবার যা অসৎ হয় তা সৎ হতে পারে না। বস্তুকে সৎ, অসৎ, সদাসৎ এবং সদাসৎ ভিন্ন –এরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কোনও শ্রেণীতে পর্যবসিত করা যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু মাধ্যমিক সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সবকিছু শূন্য তথা 'সর্বম্ শূন্যম্'।

যদি কোনও কিছুর স্বকীয় স্বভাব বলে কিছু না থাকে তাহলে প্রমাণ প্রমেয় তার ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়েরও স্বকীয় স্বভাব বলে কিছু থাকা সম্ভব নয়। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে নাগার্জুন এটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যে, জ্ঞানের করণ (প্রমাণ) বলে কোনোকিছু থাকা যেমন সম্ভব নয়, একইভাবে জ্ঞান (প্রমা) বলেও কোনোকিছু থাকা সম্ভব নয়। নাগার্জুনের এরূপ অবস্থানের সঙ্গে জয়রাশির অবস্থানের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও দু'জনের অবস্থানের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বুদ্ধদেবের অনুগামী হিসাবে নাগার্জুনের মধ্যে নির্বাণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অর্থাৎ নাগার্জুন বৌদ্ধ হওয়ায় নির্বাণকে তারপক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব। এমন অবস্থায় একদিকে শূন্যতা তত্ত্বকে বাঁচাতে এবং অন্যদিকে নির্বাণ তত্ত্বকে বজায় রাখতে নাগার্জুন অভিজ্ঞতাপূর্ণ সংশয়বাদ (emperical scepticism) এবং অতীন্দ্রিয় অজ্ঞেয়তাবাদের (transcendental agnosticism) প্রবর্তন করেন।

ভারতীয় দর্শনে নৈয়ায়িক এবং আরও অন্যান্য সম্প্রদায় যে পদার্থের বিভাগ করেন সেগুলিকে নাগার্জুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বৈদল্যপ্রকরণ, বিগ্রহব্যাবর্তনী এবং মূলমধ্যমককারিকাতে নানান যুক্তির দ্বারা সেগুলিকে খণ্ডন করেন। বৈদল্যপ্রকরণ গ্রন্থের মূল লক্ষ ছিল নৈয়ায়িকদের পদার্থ তত্ত্বের যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা তুলে ধরা, যেগুলি গৌতমপ্রদত্ত ন্যায়সূত্রে এবং বাৎসায়নভাষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। নাগার্জুন তাঁর বিগ্রহব্যাবর্তনী গ্রন্থটিতে মূলত বস্তুবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রদান করেন। সুতরাং ভারতীয় দর্শনে নৈয়ায়িক এবং অন্যান্য সম্প্রদায় প্রমাণ-প্রমেয়ের যে বিভাজন করেন তাকে নাগার্জুন বিভিন্নভাবে খণ্ডন করেন। পরবর্তীকালে ভাববিবেক, চন্দ্রকীর্তি ও আরও অন্যান্যরা

নাগার্জুনের এই সংশয়বাদী ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। নাগার্জুনের জ্ঞানীয় সংশয়বাদ সংক্রান্ত বক্তব্য পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হবে।

ভারতীয় দর্শনে জয়রাশি এবং নাগার্জুনের মতো শ্রীহর্ষও ছিলেন একজন অন্যতম বৈতণ্ডিক। যিনি ভারতীয় দর্শনে পরবর্তীকালে বৈতণ্ডিক ধারাকে অব্যাহত রাখেন। তাঁর ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতো জড়বাদী এবং অজ্ঞেয়তাবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অদ্বৈত অনুগামী। জাগতিক বিষয় সম্পর্কে অদ্বৈতবাদীরা দ্বৈতের বিরোধীতা করতেন। তাঁরা ব্রহ্মকে একমাত্র সত্তা হিসাবে স্বীকার করে জগতকে নিছক ভ্রম হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। আরও অন্যান্য অদ্বৈতবাদীদের মতো শ্রীহর্ষও জাগতিক সত্তার মিথ্যাত্ব প্রমাণে নিয়োজিত ছিলেন। জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণে শ্রীহর্ষের পদ্ধতিটি তাঁর পূর্বানুগামীদের থেকে ভিন্ন ছিল। নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকদের মতো বহুত্ববাদীদের (জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বিভাজন বিষয়ে) বিরোধীতা করতে গিয়ে তিনি দ্বান্দ্বিক যুক্তির প্রয়োগ করেন এবং দেখান যে জ্ঞানের বিষয় বা প্রমেয় বলে যেমন কিছু থাকা সম্ভব নয়, তেমনি জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ বলে কিছু থাকা সম্ভব নয়।

শ্রীহর্ষ তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্* –এর শুরুতে দেখান যে, দু'জন ব্যক্তি বা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিতর্ক বা আলোচনা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাঁরা প্রমাণের প্রামাণ্য (epistemic instrument) সম্বন্ধে সহমত হন। যারা এই তত্ত্বটি উত্থাপন করেন তাঁরা মনে করেন যে, ভারতীয় দর্শনের সমস্ত সম্প্রদায় প্রমাণ তত্ত্বে বিশ্বাসী (সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত)। উপর্যুক্ত নীতিটিকে গ্রহণ না করে কেউই কোনও

যৌক্তিক বাদানুবাদে অংশগ্রহণের দাবীদার হতে পারে না। সুতরাং বৈতণ্ডিকরা যে অপ্রমাণতত্ত্বের কথা বলেন বা প্রমাণতত্ত্বের বিরোধীতা করেন তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রমাণবাদীদের উপর্যুক্ত দাবিটিকে ধরে নিয়ে শ্রীহর্ষ নানা যুক্তির সাহায্যে এটা খণ্ডন করেন যে, অপ্রমাণবাদীরা কোনও বিতর্কে কোনও প্রতিবাদীকে পরাজিত করে জয়লাভের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করার কোনও অধিকার যেমন নেই, তেমনি বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণের জন্য কোনও আলোচনা সভাতে অংশগ্রহণেরও যোগ্য নন। এর প্রত্যুত্তরে শ্রীহর্ষ অপ্রমাণবাদীদের কাছে জানতে চান যে, এরূপ প্রাক্‌স্বীকৃতির আবশ্যিকতা কোথায়? কোনও বিতর্কে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রমাণতত্ত্বের গ্রহণ আবশ্যিক কেন? এই প্রশ্নগুলির সাপেক্ষে শ্রীহর্ষ সম্ভাব্য চারটি বিকল্প প্রদান করেন। প্রথমতঃ প্রমাণবাদী এটি দাবী করতে পারেন যে প্রমাণকে স্বীকার না করে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে প্রমাণের সত্তা সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ অর্থহীন ছাড়া আর কিছু নয়।[9] দ্বিতীয়তঃ প্রমাণবাদী বলতে পারেন যে কোনও বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল প্রমাণের গ্রহণ। তাই প্রমাণকে অস্বীকার করে বা প্রমাণের গ্রহণ না করে শব্দ প্রয়োগ করা অসম্ভব।[10] তৃতীয়তঃ প্রমাণবাদীরা খুব সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারেন যে প্রমাণের গ্রহণ বা স্বীকৃতি হল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রচলিত অনুশীলন।[11] চতুর্থতঃ তাঁরা দাবী

---

[9] কিং তদনভ্যুপগচ্ছদ্ভ্যাং বাদি প্রতিবাদিভ্যাং তদভ্যুপগম সাহিত্য নিয়তস্য বাগব্যবহারস্য প্রবর্তয়িতুমশক্যত্বাৎ- শ্রীহর্ষ, *খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্‌*, মহামহোপাধ্যায় শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য তর্কবেদান্ততীর্থ অনুবাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, কলকাতা – ৭০০০২৯, পৃঃ- ৫-৬।

[10] উত কথকাভ্যাং প্রবর্তনীয় বাগব্যবহারং প্রতি হেতুত্বাৎ- তদেব।

[11] উত লোকসিদ্ধত্বাৎ- তদেব।

করেন যে তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে প্রতিবাদীর থেকে জয়লাভের ইচ্ছা কখনই সম্ভবপর হবে না যদি না প্রমাণকে স্বীকার করা হয়।[12]

শ্রীহর্ষের মতে প্রথম বিকল্পটি যথাযথ নয়। কারণ ঘটনাবশত দেখা যায় যে চার্বাক (জয়রাশি ভট্ট) এবং মাধ্যমিকের মতো অপ্রমাণবাদীদেরকে প্রমাণবাদীদের সঙ্গে প্রমাণের সত্তা নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে ।[13] আর যেহেতু অপ্রমাণবাদীরা প্রমাণবাদীদের সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেহেতু বলা যেতে পারে প্রমাণের স্বীকৃতি বা গ্রহণ কখনই বিতর্কে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাক্-স্বীকৃতি হতে পারে না। দ্বিতীয় বিকল্পটি যে যথাযথ নয় তা প্রমাণিত হয় শারীরক ভাষ্যে, মাধ্যমিক কারিকা এবং বার্হস্পত্য সূত্রের নির্বিঘ্নে সমাপ্তি। কারণ এই সূত্রের রচয়িতারা প্রমাণের প্রামাণ্যের উপর বিশ্বাসী ছিলেন না। এখন অপ্রমাণবাদীরা কোনও বিতর্কে তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারে – এটিকে নৈয়ায়িকরা মেনে নিয়ে নিজমত ভিন্ন উপায়ে রক্ষা করতে সক্ষম। তাঁরা বলতে পারেন যে প্রতিপক্ষের মতকে খণ্ডন করে বাদী ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণের সত্তাকে স্বীকার করা হয়। নৈয়ায়িকের এই মত শ্রীহর্ষ স্বীকার করেন না। শ্রীহর্ষের মতে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে অন্যের মতের বিরোধীতা করার কারণ হিসাবে কখনই প্রমাণের অস্বীকৃতিকে দায়ী করা যায় না। বরং এর ফলাফল হিসাবে বক্তা কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে দোষের উদ্ভব হয়।[14] শ্রীহর্ষ এ বিষয়ে খুবই আশাবাদী

---

[12] অথবা তদনভ্যুপগমস্য তত্ত্বনির্ণয় বিজয় ফলাতিপ্রসঞ্জকত্বাৎ- তদেব।

[13] তদব, পৃঃ-৬।

[14] 'প্রমাণাদ্যনভ্যুপগম্য প্রবর্তিততত্বং তদীয় সাধনবাধনাক্ষমতায়াং ন নিয়ামকং কিন্তু সদ্বচনাভাস লক্ষণ যোগিত্বমিত্যবশ্যাভ্যুপেয়ং ভবতা....'- তদেব, পৃঃ-৭।

ছিলেন যে নৈয়ায়িকরা তার সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন। কারণ ঘটনাবশত দেখা যায় যে দু'জন প্রমাণবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়শই বিতর্ক হতে এবং সেখানে উভয় সম্প্রদায়ই তাদের সাধ্যমতো যুক্তি-প্রতিযুক্তি দ্বারা একে অপরের দোষ নির্ণয় করেন। সুতরাং এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোনও পক্ষের দুর্বলতা বা বিচক্ষণতার জন্যে প্রমাণের অস্বীকৃতি দায়ী হতে পারে না।

কিন্তু প্রমাণবাদীরা এখনও নিজ মতে অনড় থাকতে পারেন। তাঁরা পুনরায় যুক্তি দিতে পারেন যে, কোনও তত্ত্বকে অস্বীকার করতে গেলে প্রমাণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি প্রমাণকে অসৎ বলা হয় তাহলে কীভাবে 'প্রমাণদিনি ন সন্তি' তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হবে? এর প্রত্যুত্তরে শ্রীহর্ষ বলেন 'প্রমাণ নেই' এরূপ প্রাকস্বীকৃতিটিকে মেনে নিয়ে কোনও ব্যক্তির পক্ষে বিতর্কে অংশগ্রহণ করা আবশ্যিক হতে পারে না। এছাড়া যদি কোনও ব্যক্তি এই বিষয়টিতে সহমত পোষণ না করেন তাহলে সেই ব্যক্তি প্রমাণবাদীদের মতো প্রমাণকে গ্রহণ করে যে কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

যদিও এখানে তৃতীয় বিকল্পটির কোনও সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া গেল না তবে এই সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে শ্রীহর্ষ যেরূপ উত্তর প্রদান করতে চেয়েছিলেন তা গঠন করা খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়। শ্রীহর্ষ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ-প্রমেয়ের যে সাধারণ বিভাজন সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং পরে তা প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়ায়। তবে পরবর্তীকালে

শ্রীহর্ষ এই প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তনের কথা বলেন। কারণ এই রীতিনীতি কখনই কোনও থিসিস বা তত্ত্বের পুনরুদ্ধারের সপক্ষে যথাযথ যুক্তিপ্রদান করতে পারে না।[15]

৩.৩. বৈতণ্ডিক জয়রাশি ভট্ট ও তাঁর সার্বিক সংশয়

প্রায়শই বৈতণ্ডিক শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে গৃহীত হয়। এই বৈতণ্ডিক অভিধাটি এমন কোনও ব্যক্তি বা সমষ্টিকে সূচীত করে যারা যে কোনও ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা চিরাচরিত রীতিনীতির প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। কিন্তু দৃঢ় অর্থে 'বৈতণ্ডিক' শব্দটি এমন কোনও ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যিনি অন্যের সমস্ত তত্ত্বকে খণ্ডন করেন নিজের কোনও ধরনের অবস্থান বা তত্ত্ব প্রদান ছাড়াই। আর এই 'বৈতণ্ডিক' শব্দটিকে বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করে এমন একজন দার্শনিকের কথ সবার আগে মাথায় আসে যিনি হলেন চার্বাক দর্শনের মধ্যমণি জয়রাশি ভট্ট।

দর্শন জগতে জয়রাশি ভট্টের অবস্থানকে কেন্দ্র করে দার্শনিক মহলে নানা মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মতো ভারতীয় দার্শনিকগণ মতামত দেন যে জয়রাশি ভট্ট চার্বাক সম্প্রদায়ের বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে এখানে এটি উল্লেখ করা দরকার যে, জয়রাশি ভট্টের ' তত্ত্বপপ্লবসিংহ' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে বরোদা ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট থেকে। যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধকার ছিলেন রসিকলাল পারিখ। যিনি তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জয়রাশি ভট্টকে বৃহস্পতির (8th century A.D) অনুগামী হিসাবে উল্লেখ করেন। আবার 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' এর গ্রন্থাকার মাধবাচার্য এবং 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' এর

---

[15] '...কিং নাম সন্তি ন সন্তি বা প্রমাণাদীনীত্যস্যাং ....প্রবর্ত্যতামিতি'- তদেব, পৃঃ-৮।

গ্রন্থাকার হরিভদ্র সূরী জয়রাশি ভট্টকে লোকায়ত সম্প্রদায়ের অনুগামী হিসাবে বর্ণনা করেন।[16] আবার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ওয়াল্টার রুবেনের মতো পণ্ডিতগণ জয়রাশি ভট্টকে জড়বাদী বলে স্বীকার করতেন না। তাঁদের মতে কোনও ব্যক্তি যদি সকল তত্ত্বের উপপ্লব বা খণ্ডন করেন, তাহলে তাকে ভূতচতুষ্টয়বাদী বলা যায় না। সিংহ যেমন জঙ্গলের অন্যান্য কোনও পশুর প্রতি সহানুভূতিশীল হয় না তেমনি 'তত্ত্বপপ্লবসিংহ' এর গ্রন্থকার কোনও ধরনের নীতি বা যুক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল নন। 'তত্ত্বপপ্লবসিংহ' গ্রন্থটি হল এমন গ্রন্থ যেখানে মূলত সকল ধরনের তত্ত্বকে বিনা দ্বিধায় উপপ্লব বা খণ্ডন করা হয়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এবং রুবেনের মতো পণ্ডিতগণ জয়রাশি ভট্টকে শ্রীহর্ষ এবং নাগার্জুনের মতো ভাববাদী এবং চরমবাদী (absolutist) হিসাবে বর্ণনা করেন। নাগার্জুন এবং শ্রীহর্ষ দর্শনের চিরাচরিত কাঠামোকে বিশেষত জড়বাদী এবং বহুত্ববাদীর প্রাচীরকে ভাঙতে গিয়ে এবং তাঁরা তাঁদের নিজস্ব তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মূলত দ্বান্দ্বিক যুক্তির (dialectical argument) প্রয়োগ করেছিলেন। এই বিতর্কিত দাবিটিকে তৃতীয় একটি মত হিসাবে গণ্য করা হয়। এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা এটা অস্বীকার করেন যে, জয়রাশির ধ্বংসাত্মক, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে তাঁর মনে কোনও গোপন অভিসন্ধি ছিল। বরং তিনি মনে করেন জয়রাশি হলেন একজন সংশয়বাদী। আর এই তৃতীয় মতটির প্রবক্তা হলেন কৃষ্ণকুমার দীক্ষিত।[17] তিনি আরও বলেন যে জয়রাশি ভট্ট কেবলমাত্র সংশয়বাদীই ছিলেন না,

---

[16] Bhatta, Jayrasi, *Tattvopaplavasimha*, ed. Svami Dvarikadasasastri, Bauddha Bharati, Varanasi, 1987, p.i.
[17] K. K. Dixit: The Ideological Affiliation of Jayarasi, Indian Studies: Past and Present, 1962, p.98.

বরং চরম সংশয়বাদী ছিলেন। যার মধ্যে জড়বাদ এবং ভাববাদের ছোঁয়া বিন্দুমাত্র ছিল না।

উপর্যুক্ত বিকল্পটি থেকে এটা স্পষ্ট যে, জয়রাশি ভট্ট চার্বাক দর্শনের একজন অন্যতম নক্ষত্র ছিলেন। এছাড়া আরও বালা যায় যে 'তত্ত্বপপ্লবসিংহ' এর গ্রন্থকার আধিবিদ্যক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নৈতিক প্রাক্‌স্বীকৃতি সম্বন্ধে তাঁর পূর্বসূরীদের সঙ্গে সহমত ছিলেন না। কারণ চার্বাক দর্শনের চিরপ্রসিদ্ধ জড়বাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং সুখবাদ তত্ত্বকে জয়রাশি ভট্ট কখনই স্বীকার করতেন না। জগতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চার্বাকরা জড়বাদের কথা বলেন এবং তাঁরা জাগতিক বস্তু যেমন- জীবন, মন, চৈতন্য ইত্যাদি সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাভূতের কথা বলেন। যদিও চার্বাকরা নিত্য আত্মা, পরমেশ্বর, পরজন্ম এবং মুক্তিতে বিশ্বাসী নন তথাপি চিরাচরিত চার্বাকরা জড় পরমাণুর সত্তাতে এবং জাগতিক বস্তুতে বিশ্বাস করতেন। এছাড়া চার্বাকরা মনে করতেন জড়ের স্থূল অনু থেকেই স্থূল জগতের উৎপত্তি। জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চার্বাকরা কঠোর ছিলেন না। কারণ তাঁরা কখনই সকল প্রমাণের তীব্র বিরোধিতা করেননি। যদিও চার্বাকরা অনুমান, উপমান, শব্দ এছাড়া আরও অন্যান্য জ্ঞান লাভের উপায়গুলিকে অস্বীকার করেন, তথাপি প্রত্যক্ষকে তাঁরা জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে কখনো অস্বীকার করেননি। বরং জ্ঞানলাভের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু জয়রাশি ভট্ট চিরাচরিত চার্বাকদের দ্বারা স্বীকৃত জ্ঞানতত্ত্ব এবং সত্তাতত্ত্বকে কখনই বহন করেননি। তিনি তীব্রভাবে প্রমাণ-প্রমেয়ের বিভাজনকে অস্বীকার করেন এবং বলেন প্রমাণ-প্রমেয়ের এই বিভাজন কেবলমাত্র ব্যবহারের অযোগ্যই নয়, বরং অর্থহীনও

বটে।[18] জয়রাশির মতে বৈধ জ্ঞানের দাবী কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বৈধ জ্ঞানলাভের কারণগুলি সর্বদা দোষদুষ্ট। আর যেহেতু কারণগুলি অদোষদুষ্ট হতে পারে না সেহেতু প্রকৃত জ্ঞানের বিষয় হিসাবে কিছু থাকা সম্ভব নয়।

জয়রাশি তাঁর নিজের অবস্থানটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চিরাচরিত প্রমাণের সকল লক্ষণগুলিকে এক এক করে পরীক্ষা করেছিলেন। জয়রাশি তাঁর 'তত্ত্বপপ্লবসিংহ' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ন্যায় সম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণটিকে পরীক্ষা করেছিলেন। তারপর এই গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে আরও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় সম্মত প্রমাণগুলিরও পরীক্ষা করেন। যেমন- মীমাংসক সম্মত বৈধ জ্ঞানের কারণ, বৌদ্ধ সম্মত প্রমাণ, সাংখ্য সম্মত প্রত্যক্ষ, ন্যায়ের অনুমান, বৌদ্ধের অনুমান ইত্যাদি। এছাড়াও আরও নানান সম্প্রদায়ের নানান প্রমাণের পরীক্ষা করেন। সকল পরীক্ষার শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আদৌও প্রমাণ বলে কোনও কিছু নেই এবং প্রমাণ বিনা প্রমেয় বলে কিছু থাকা সম্ভব নয়।

৩.৩.১. নৈয়ায়িক সম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণের খণ্ডন

পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে জয়রাশি ভট্ট তাঁর 'তত্ত্বপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ইত্যাদি জ্ঞানলাভের উপায়গুলিকে কখনই প্রমাণ বলে স্বীকার করেননি। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায় প্রমাণকে জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে স্বীকার করলেও জয়রাশি ভট্ট প্রত্যক্ষকে কখনই যথার্থ জ্ঞানলাভের

---

[18] Bhatta, Jayarasi, *Tattvopaplavasimha*, ed. Svami Dvarikadasasastri, Bauddha Bharati, Varanasi, 1987, p.1.

উপায় হিসাবে স্বীকার করেননি। জয়রাশি ভট্ট মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে দেখান যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণটি আদৌও যথাযথ নয়। এই নিরিখে এখানে বলে রাখা দরকার যে, মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' -এ প্রমাণের চারটি প্রকার উল্লেখ করেন। সেগুলি হল- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। এরপর মহর্ষি গৌতম উপর্যুক্ত চারটি প্রমাণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রমাণ প্রত্যক্ষের লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্' (১.১.৪)। এই লক্ষণটিতে মূলত পাঁচটি পদের তাৎপর্য লক্ষণীয়। প্রথমত, এটা উল্লেখ করা দরকার যে, কোনও কিছুর প্রত্যক্ষ হতে গেলে তার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল এমন জ্ঞান যা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অব্যবহিত পরে উৎপন্ন হয়। তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ থাকা আবশ্যক। তৃতীয়ত বলা যায় যে প্রত্যক্ষ হল এমন এক ধরনের জ্ঞান যা অশাব্দিক বা ব্যপদেশ নয় (অব্যপদেশ্যম্)। সাধারণত তখনই কোনও বস্তুর জ্ঞানকে কোনও নামের দ্বারা আখ্যায়িত করা হয় যখন জ্ঞানটি ইন্দ্রিয় বিষয়ের সংযোগের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। যদিও কোনও কিছুর প্রতীতি হওয়ার পরেই আমরা যখন তাকে কোনও নামের দ্বারা আখ্যায়িত করি তখন এই জ্ঞানীয় পদ্ধতিটি অশাব্দিক হয়ে থাকে। চতুর্থত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে অশাব্দিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেটিকে অবশ্যই অব্যভিচারী হতে হবে। অব্যভিচারী বলতে মূলত অভ্রান্তিকে বোঝায়। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষের লক্ষণটি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কারণ ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে কিছু অশাব্দিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেগুলি ভ্রান্ত। এই অশাব্দিক ভ্রান্ত জ্ঞানগুলিকে কখনই যথাযথ প্রত্যক্ষ বলা যায় না। তাই প্রত্যক্ষের

লক্ষণে অব্যভিচারী পদটি নিবেশ করে অশাব্দিক ভ্রান্ত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানটিকে অবশ্যই নিশ্চয়াত্মক হতে হবে। যদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন কোনও জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক না হয় তবে সেটিকে আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। প্রত্যক্ষের লক্ষণে গ্রন্থকার 'নিশ্চয়াত্মক' পদটি নিবেশ করেছেন সংশয়াত্মক জ্ঞানকে বাদ দেওয়ার জন্য। কারণ দৈনন্দিন জীবনে দূর থেকে কোনও কিছুকে দেখে অনেকসময় আমাদের এরকম জ্ঞান হয় যে, ওটা দড়ি না সাপ? আর এইরূপ জ্ঞানকে কখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে গেলে যে বস্তুটিকে কেন্দ্র করে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার নিশ্চয়তা থাকা দরকার। গ্রন্থাকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রত্যক্ষের উপর্যুক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যই প্রত্যক্ষের লক্ষণে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরে এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে নানা মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। তাঁদের মধ্যে বাচস্পতিসহ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে প্রত্যক্ষের লক্ষণে উল্লিখিত 'অব্যপদেশ্য' এবং 'ব্যবসায়াত্মকং' পদ দুটি প্রত্যক্ষের দুটি বিভাগকে নির্দেশ করে। সেগুলি হল- নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। যাইহোক যথার্থ জ্ঞান হিসাবে প্রত্যক্ষকে 'অব্যভিচারী' হিসাবে বোঝা অনেকখানি যথাযথ বলে মনে হয়। আবার এরকমও বলা হয় যে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 'অব্যভিচারী' ধর্মটি আসাধারন ধর্ম নয়, বরং কোনও বৈধ জ্ঞানের একটি পূর্বশর্ত, তা অনুমান, উপমান, শব্দ যাইহোক না কেন। আরও বলা যেতে পারে 'অব্যভিচরিতত্ব' ধর্মটি প্রত্যক্ষের লক্ষণে দেওয়া হয়েছে লক্ষণটিকে বিশিষ্ট (qualifier) করার জন্য। 'অব্যভিচরিতত্ব' ধর্মটি সকল বৈধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য আরও বৈধ জ্ঞানের লক্ষণগুলিতে এই পদটি

উল্লিখিত হয়নি, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ছাড়া। কারণ সকল বৈধ জ্ঞানের পূর্ববর্তী জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ।

তবে জয়রাশি ভট্ট প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অব্যভিচারী' পদটির প্রয়োগের গুরুত্ব বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই জয়রাশি ভট্ট এই 'অব্যভিচারী' অভিধাটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। কারণ তিনি এটা জানতেন যদি কোনোকিছুর ভীতকে নড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই ভীতের উপর নির্মিত অট্টালিকাটিও অবশ্যই ভেঙে পড়বে। গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটির বিরুদ্ধে জয়রাশি ভট্টের আপত্তি মূলত 'অব্যভিচারী' অভিধাটিকে কেন্দ্র করে। তাই এখন দেখা দরকার, যে অভিধাটিকে কেন্দ্র করে জয়রাশির আপত্তি সেই 'অব্যভিচারী' অভিধাটি নৈয়ায়িকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কেমন? 'অব্যভিচারী' অভিধাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল অভ্রান্ত জ্ঞান। কিন্তু এটি জানা প্রয়োজন যে এই অভ্রান্ত জ্ঞানটি আসলে কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অভ্রান্ত জ্ঞান হল এমন একটি জ্ঞান যা ভ্রান্ত জ্ঞান থেকে ভিন্ন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কখন আমরা কোনও জ্ঞানকে ভ্রান্ত বলে চিহ্নিত করবো? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে তখনই কোনও জ্ঞানকে ভ্রান্ত বলা সম্ভব যখন কোনও বস্তুর মধ্যে নিহীত ধর্মটি বস্তুটির জ্ঞান লাভের সময় যথাযথ প্রতিফলিত হয় না তখন সেই জ্ঞানটিকে ভ্রান্ত জ্ঞান বলা হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে কোনও ধর্মীতে যে ধর্মটি থাকার কথা যদি সেই ধর্মীটিতে সেই ধর্মটি আশ্রিত না থাকে তাহলে তাকে ভ্রান্ত জ্ঞান বলে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এটি খুবই সুপ্রতিষ্ঠিত বিপর্যয় হিসাবে। অন্যদিকে 'অব্যভিচারী' বা অভ্রান্ত জ্ঞান বলতে বোঝায় বস্তুর মধ্যে যে ধর্মটি বিদ্যমান জ্ঞানে সেই ধর্মটির যথাযথ প্রতিফলন। 'অব্যভিচারী' পদের আলোচনা প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন বলেন

'অতস্মিনতদিতিপ্রত্যয়ব্যভিচারী, তস্মিনতদিতিপ্রত্যয়অব্যভিচারী'।[19] অর্থাৎ যখন জ্ঞান বা প্রত্যয় অতৎকে তৎ হিসাবে বা যেটি যা নয় তাকে সেইরূপে প্রকাশিত করে তখন তাকে ব্যভিচারী বলা হয়। অপরদিকে যখন জ্ঞান বা প্রত্যয় তৎ-কে তৎ হিসাবে বা যেটিতে যা ধর্ম আছে তাকে সেই ধর্মরূপে প্রকাশিত করে তখন তাকে বলা হয় অব্যভিচারী। আবার নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ অব্যভিচারী এবং ব্যভিচারী জ্ঞান প্রসঙ্গে যথাক্রমে বলেন 'তদ্ভাবতিতৎপ্রকারকনিশ্চয়' এবং 'তদব্যতীততৎপ্রকারকনিশ্চয়'। এখন উপরিউক্ত লক্ষণ দুটিকে বোঝার জন্য দুটি উদাহরণ দেওয়া হল। প্রথমটি হল- 'ঘটে ঘট জ্ঞান', দ্বিতীয়টি হল- 'দড়িতে সর্পের জ্ঞান'। যখন 'ঘটে ঘটত্ব আছে'- ঘটে কোনও ব্যক্তির এরূপ জ্ঞান হয় তখনই সেই ব্যক্তি ঘটকে ঘট হিসাবে জানে। ঘট হল এখানে জ্ঞানের বিষয়। আর ঘটত্ব হল একটি ধর্ম, যা ঘটে থাকে। এই জ্ঞানটি (ঘটে ঘট জ্ঞান) অব্যভিচারী। কারণ বস্তুটিতে বা ঘটে যে ধর্মটি থাকে (ঘটত্ব) জ্ঞানও সেই ধর্মটি প্রকাশ করে। কিন্তু যখন কোনও ব্যক্তি দড়িকে সাপ হিসাবে চিহ্নিত করে তখন জ্ঞানটি ব্যভিচারী হয়ে পরে। কারণ জ্ঞান যে সর্পত্ব নামক ধর্মটিকে প্রকাশ করছে সেই ধর্মটি বস্তুটিতে (দড়িতে) থাকে না। ঘটনাবশত সেখানে বস্তুটি হল দড়ি, তা সাপ নয়। অর্থাৎ জ্ঞানে যে 'তদ্'টি প্রতিফলিত হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে বস্তুতে সেই 'তদ্'টি বিদ্যমান থাকে না। ফলে দুটি 'তদ্' ভিন্ন হয়। তাই এটি ব্যভিচারী হয়ে যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গে প্রমার আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। ন্যায় মতে প্রমা বলতে বোঝায় যথার্থ জ্ঞানকে। এখন প্রশ্ন যে যথার্থ জ্ঞানকে আমরা প্রমা বলে দাবী করছি তা আসলে

---

[19] ন্যায় তর্কতীর্থ তারানাথ এবং তর্কতীর্থ অমরেন্দ্রমোহন, *ন্যায়দর্শনম*, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ- ১১৩।

কী? কী কারণেই বা তা সত্য? ঠিক কোন কোন শর্ত পূরণ করলে একটি প্রতীতি প্রমা বলে গণ্য হয়। লোক বিশ্বাসে এর নানা উত্তর পাওয়া যায়। ভারতীয় দার্শনিকরাও এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন নানা ভাবে। বৌদ্ধ দর্শনে প্রমাকে সম্যগ জ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। *ন্যায়বিন্দুতে* ধর্মকীর্তি সম্যগ জ্ঞান হিসাবে প্রমার পরিচয় দিলেও সম্যগ জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেননি। তবে এই সম্যগ জ্ঞান আসলে যে অবিসংবাদক জ্ঞান তা তিনি স্পষ্ট করেছেন প্রমানবার্তিকে।[20] জৈন দর্শনে প্রমাণ ও প্রমাণফল উভয় অর্থে প্রমা কথাটি ব্যবহিত হয়েছে। এই প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে মানিক্যনন্দী তাঁর পরীক্ষামুখসুত্র-১ বলেছেন- "স্বাপূর্বার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণম্"।[21] অর্থাৎ স্ব বা নিজ এবং অপূর্ব বা অনধিগত পূর্ব বিষয়ের ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ সংশয়াদি ভিন্ন বা নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান তাই প্রমান। ফলতঃ জৈন অনুমোদিত প্রমাণের সামান্য লক্ষণটি হল- নিজের এবং অন্যের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রমাণ।[22] ন্যায় দর্শনে প্রমাকে যথার্থ অনুভব হিসাবে দেখা হয়েছে এবং নানাভাবে সেই যথার্থ অনুভবের লক্ষণ করা হয়েছে। কখনও তাকে বলা হয়েছে অব্যাভিচারী। কোথাও তাকে সেই জ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা প্রবৃত্তি সাফল্যের সঙ্গে নিয়ত সম্বদ্ধ। কোথাও এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'তস্মিনস্তদিতি' প্রত্যয় হিসাবে।[23] কোথাও বা তদ্বতিতৎপ্রকারক অনুভব হিসাবে।[24] বৈশেষিক দর্শনে প্রমাকে বিদ্যা এবং অপ্রমাকে অবিদ্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদ্যার লক্ষণ দিতে গিয়ে সুত্রকার কনাদ বলেছেন- 'অদুষ্টং বিদ্যা' অর্থাৎ অদুষ্ট

---

[20] "প্রমাণমবিসংবাদি জ্ঞানম্"- *প্রমানবর্তিকম্,* প্রমানসিদ্ধি, কারিকা- ৩।

[21] *পরীক্ষামুখসুত্রম্,* ১/১।

[22] "স্বপরব্যবসায়িজ্ঞানং প্রমানম্"-প্রমাননয়তত্ত্বালোক।

[23] *ন্যায়সূত্রভাষ্য* ১/১/৪,

[24] *তর্কসংগ্রহ,* P- 282.

জ্ঞানই বিদ্যা।[25] সাংখ্য মতে প্রমা হল পুরুষের বোধ বা জ্ঞান।[26] এই প্রমা জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন – "অসন্দিগদ্ধাবিপরীতনধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ"।[27] মীমাংসকদের মধ্যে গুরু প্রভাকর জ্ঞান ও প্রমার মধ্যে কোনও ভেদ করেননি। তাঁর মতে জ্ঞান মাত্রই বিষয়ে অব্যভিচারী এবং প্রমা। কুমারীল ভট্ট প্রমা জ্ঞানের সঙ্গে অপ্রমা জ্ঞান স্বীকার করেছেন এবং প্রমার লক্ষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন – স্মৃতি ভিন্ন কারণ দোষরহিত অবাধিত অজ্ঞাত বিষয়ক জ্ঞানই হচ্ছে প্রমা।[28] অদ্বৈত বেদান্তেও প্রমা বিষয়ে ভাট্ট মত সমর্থিত হয়েছে। যা অনুসারে প্রমা হল অনধিগত, অবাধিত অর্থ বিষয়ক জ্ঞান।[29] এই লক্ষণগুলির কোনটিই সংশয়বাদী দৃষ্টিতে নির্দোষ নয়। তাদের দাবী প্রমা এমন কিছু যা লক্ষণ যোগ্য নয়। আর যা লক্ষণ যোগ্য নয় তাকে বাস্তব বা সৎ বলে দাবী করা যায় না। এমতাবস্থায় একটি সত্য জ্ঞান এবং একটি মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে মর্যাদাগত কোনও তফাৎ থাকে না।

এবার প্রমার নানা প্রকার প্রসঙ্গে আসা যাক। সাবেকি জ্ঞানতাত্ত্বিকরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদি জ্ঞানের নানা প্রকারের মধ্যে তফাৎ করে থাকেন। এগুলির মধ্যে সব জ্ঞানই যে সত্য তা নয়, কিছু মিথ্যা জ্ঞানও আছে। প্রতিটি জ্ঞানই নানা শর্তের উপর নির্ভর করে। ন্যায় মতে প্রত্যক্ষের কথা ধরা যাক। ইন্দ্রিয়, বিষয়, উভয়ের মধ্যে সন্নিকর্ষ, আত্মমনঃসংযোগ ইত্যাদি নানা কারণ বর্তমান থাকে প্রত্যক্ষের পিছনে।

---

[25] 'অদুষ্টং বিদ্যা'- 9/2/12, *বৈশেষিকসূত্র ও তর্কসংগ্রহ*, P- 125.

[26] "বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা"- সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বকৌমুদী, P- 97.

[27] *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (কারিকাযুতা), P- 40.

[28] *শ্লোকবার্তিক*, P- 150-151.

[29] *বেদান্ত পরিভাষা*, P- 7-9.

কোনও একটি শর্তের অভাব ঘটলে প্রত্যক্ষ ব্যাহত হয়। এমনকি যেখানে সব শর্তগুলোই উপস্থিত সেখানেও প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত হতে দেখা যায়। যেমন দূর থেকে একটি অরন্যের দিকে তাকালে একটি কালো কাগজের মতো দেখায়। তখন গাছগুলোকে বা তাদের পাতা গুলোকে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করা দ্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয় না। এখানে দূরত্বই সঠিক প্রত্যক্ষের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে একজন পাণ্ডুরুগীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের সব সহায়ক শর্ত উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় কিঞ্চিত হলুদবর্ণের। প্রত্যক্ষকারীর প্রত্যাশা, আবেগ ইত্যাদির দ্বারাও তার প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হতে দেখা যায়। যে বন্ধুর প্রত্যাশায় রয়েছে তার কাছে হাল্কা একটা শব্দ দরজায় টোকা বলে মনে হয়। কাজেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান নানাভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। এই বিঘ্ন তিন ধরনের হতে পারে শারীরিক, মানসিক ও পরিবেশগত। এই সমস্ত বিঘ্নের সম্ভাবনা থেকে প্রত্যক্ষ মুক্ত নয়। প্রত্যক্ষের সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানেরও ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা উন্মুক্ত থাকে। প্রমাকে বিঘ্নশূন্য জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন মীমাংসা সূত্রের ভাষ্যকার সবরস্বামী। এই মত মানলে কোনও একটি জ্ঞান প্রমা কিনা তা বোঝার জন্য জ্ঞান সামগ্রির মধ্যে কোন দোষ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হয়। প্রশ্ন হল জ্ঞানের সকল সামগ্রী যে দোষরহিত তা আমরা জানবো কীভাবে? লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুয়ায়ী এই বিচার প্রত্যক্ষ, অনুমান, অথবা শব্দের দ্বারা সম্ভব। কিন্তু সংশয়বাদী মনে করেন এই সকল উপায়ের দ্বারা জ্ঞান সামগ্রী শারীরিক, মানসিক বা পরিবেশগত সর্বপ্রকার ত্রুটি মুক্ত কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। এব্যাপারে জয়রাশি তাঁর 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে বিষদ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন।

আর এই ভাবে জয়রাশি তথা সংশয়বাদীরা দাবী রেখেছেন যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলির কোনটি প্রকৃত জ্ঞানের জনক হতে পারে না।

তথাকথিত প্রমাণগুলির কোনটি যে সঠিক অর্থে প্রমাণ বলে গণ্য নয় সেকথা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জয়রাশি তার তত্ত্বপপ্লবসিংহে প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রত্যক্ষ একটি সর্বসম্মত প্রমাণ। প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও প্রমাণবাদিরা সকলেই এটিকে জ্যেষ্ঠ প্রমাণের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এই সর্বজন স্বীকৃত প্রমাণটির বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি তুলে ধরতে গিয়ে জয়রাশি প্রত্যক্ষের গৌতম প্রদত্ত লক্ষণটির অসংগতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের উল্লেখের পর প্রমাণের চতুর্বিধত্বের কথা বলেছেন। এরপর ঐ চতুর্বিধ প্রমাণের অগ্রগণ্য প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষ জনিত অব্যপদেশ্য বা অশাব্দ অব্যভিচারী বা ভ্রমশূন্য ব্যবসাত্মক বা নিশ্চাত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষ[30] – এই লক্ষণ প্রসঙ্গে জয়রাশির প্রশ্ন হল 'অব্যভিচারী' বিশেষণটি প্রত্যক্ষের লক্ষণে প্রদত্ত হয়েছে কেন? এই পদটি ব্যবহারের সম্ভাব্য হেতু নিরূপণ করতে গিয়ে জয়রাশি কতকগুলি বিকল্পের কথা বলেছেন। প্রথমত প্রত্যক্ষ দোষরহিত কারণসমূহ হতে উৎপন্ন একথা বোঝানোর জন্য পদটি ব্যবহিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ বাধারহিত বা অবাধিত একথা বঝাতেও পদটির ব্যবহার হতে পারে। তৃতীয়ত অব্যভিচারী পদটি ব্যবহারের দ্বারা প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি সামর্থ্য বোধিত হতে পারে। অথবা

[30] *ন্যায়সূএভাষ্য* ১/১/৪,

উল্লেখিত কারণগুলি ছাড়া অন্য কোনও কারণে পদটি লক্ষণে সন্নিবিষ্ট হতে পারে। কিন্তু পদটির (অব্যভিচারী) ব্যবহার কোনও দিক থেকে স্বার্থক নয়।

প্রথমতঃ 'অব্যভিচারী' শব্দটি প্রত্যক্ষ দোষরহিত কারণ হতে উৎপন্ন এই অর্থে ব্যবহিত হতে পারে না। দোষরহিত কারণসমূহ হতে উৎপন্ন হওয়ার কারণে যদি প্রত্যক্ষ অব্যভিচারী হয়, তাহলে জয়রাশির প্রশ্ন, কারক সমূহের ঐ অদুষ্টতা জানা যাবে কীভাবে? প্রত্যক্ষের দ্বারা ঐ অদুষ্টতা জানা যেতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষের ঘটক যে ইন্দ্রিয় তা নির্দোষ কি না তা জানা সম্ভব নয়। যেমন যে নয়নের সাহায্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় সেই নয়নের অদুষ্টতা অতীন্দ্রিয়।[31] চক্ষুর সাহায্যে চক্ষুর নির্দোষতা বা অদুষ্টতা জানা সম্ভবপর নয়। অনুমানের দ্বারা ও ইন্দ্রিয়ের অদুষ্টতা জানা যেতে পারে না। কারণ অনুমান অনুমাপক বা হেতু নির্ভর কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহের অদুষ্টতার সাধক কোন হেতু নেই।[32] ফলের দ্বারাও কারকের অদুষ্টতা প্রমাণিত হয় না। বিষয়েন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জন্য যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের উৎপত্তিকে ইন্দ্রিয়ের অদুষ্টতার অনুমাপক বললে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের উৎপত্তি হয়। দুটি বিষয়ের সিদ্ধি যদি পরস্পরকে আশ্রয় করে বা পরস্পর সাপেক্ষ হয় তাহলে অন্যোন্যাশ্রয় প্রসঙ্গ হয়। ইন্দ্রিয়ের অদুষ্টতার দ্বারা যেমন জ্ঞানের অব্যভিচারিতা প্রমাণিত হয়, তেমনি উৎপন্ন জ্ঞানের অব্যভিচারিতা দ্বারা উৎপাদক ইন্দ্রিয়ের অদুষ্টতা প্রমাণ করতে গেলে একধরণের দোষ হতে বাধ্য। এখানে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের অদুষ্টতা সিদ্ধ হয়, কাজেই উৎপন্ন

---

[31] 'ন প্রত্যক্ষেণ; নয়নকুশলাদেরতীন্দ্রিয়ত্বাৎ', Sanghavi, P. S and Parikh, Rasiklal C. eds, *Tattvopaplavasimha,* P-২

[32] 'নাপ্যনুমানেন; লিঙ্গান্তরাহনবগতেঃ', Sanghavi, P. S and Parikh, Rasiklal C. eds, *Tattvopaplavasimha*, P-২

জ্ঞানের অব্যাভিচারীতা নিশ্চয় নিঃপ্রয়োজন। কিন্তু তা তিনি বলতে পারেন না। সেক্ষেত্রে ব্যভিচারী জ্ঞানের ঘটক যে ইন্দ্রিয় কারক সমূহ তাদেরও নির্দোষ বলতে হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে উৎপন্ন জ্ঞানে যেহেতু দোষের আশঙ্কা থাকে না তাই কারক ব্যাপারের মধ্যে দোষের অভাবই প্রমাণিত হয়। সেক্ষেত্রে জয়রাশির বক্তব্য হল পুরুষ ব্যাপার দ্বারা উৎপাদিত শব্দ বিজ্ঞানে দোষ শঙ্কা হয় না। একইভাবে দোষগুনাশ্রয় ইন্দ্রিয়গুলি থেকে উৎপন্ন বিজ্ঞানেও দোষশঙ্কা হয় না। অথচ বাস্তবে ঐ সকল ক্ষেত্রে কারকগত দোষ নিহিত থাকে। এমতাবস্থায় দোষ শঙ্কার অভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অদুষ্টতা প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয় ব্যাখা অনুসারে অব্যভিচারী বিশেষণটির ব্যবহার প্রত্যক্ষের বাধাহীনতাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানের কোনরূপ বাধক জ্ঞান না থাকায় তা অব্যভিচারী। এককথায় অবাধিতত্বই অব্যভিচারী হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু এই বিকল্প যথার্থ নয়। কারণ সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে উৎপন্ন জ্ঞানটি কি যথার্থ রূপে গৃহীত হয় বলে তার বাধার অনুৎপত্তি হয় নাকি বাধক জ্ঞানের কারক সামগ্রির বৈকল্যবশতই সেই বাধক জ্ঞানের অনুৎপত্তি হয়। বক্তব্য এই জ্ঞানটি অবাধিত হওয়ার মূলে যেমন জ্ঞানটির যথার্থতা থাকতে পারে তেমনি কোনও কারণে বাধকজ্ঞান উৎপন্ন না হওয়ার ব্যাপারটিও থাকতে পারে। সুতরাং এই সংশয়ের মধ্যে অবাধিত হওয়ার কারণে কোন জ্ঞান যথার্থ এমন দাবি করা সংগত নয়। এই প্রসঙ্গে মরীচিকায় জল ভ্রমের কথা বলেছেন জয়রাশি। যেমন সূর্য কিরন মরু বালুকার উপর পতিত হলে বালুকায় জল জ্ঞান হয়। অর্থাৎ কিনা ঐ জ্ঞানের কোন বাধক জ্ঞান হয় না। বারংবার দর্শনের ফলে অথবা ঐ প্রদেশের কোনও অধিবাসীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে ঐ বাধার উৎপত্তি হয়। তবে ঐ বাধা

উৎপন্ন হতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। কোনও কোনওঁ ক্ষেত্রে আবার (কারণ অভাবে) কখনই বাধক জ্ঞান হয় না। সুতরাং বাধক জ্ঞানের অনুৎপত্তির দ্বারা জ্ঞানের প্রমাত্ব সিদ্ধ হয় না। আরও কথা বাধাবিরহ বা প্রতিবন্ধকের অভাব দ্বারাই বাধ সদ্ভাবের জ্ঞান হয়। প্রতিবন্ধকের সৎভাব জ্ঞানবশতই প্রতিবন্ধকের অভাবের জ্ঞান হয়। যদি প্রতিবন্ধকের সম্ভবনা না থাকতো, তাহলে তার অভাব প্রসঙ্গই উত্থাপিত হতো না। এমতাবস্থায় বাধা বিরহ কি সকল পুরুষের প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের অভাবকে বোঝাবে? নাকি শুধু জ্ঞাতা পুরুষের (প্রতিপত্তা)? যদি সকল পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকের অভাব সূচিত হয়, তাহলে পুরুষ মাত্রে সর্বজ্ঞত্বের আপত্তি হবে। আর যদি সকলে সর্বজ্ঞ হয়ে যায়, তাহলে অসর্বজ্ঞ শব্দটি লুপ্ত হয়ে যাবে (সেক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ বলার আর কোনো তাৎপর্য থাকবে না)। আর যদি বাধাবিরহ বলতে শুধু জ্ঞাত্রিপুরুষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের অভাব বোঝায়, তাহলে ঐ প্রতিবন্ধকের অভাব না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞাতার যেসব ভ্রম হয় সেগুলির কি ব্যাখ্যা হবে। যেমন- জ্ঞাত্রিপুরুষ যখন দেশান্তর গমন করেন (অথবা যখন তাঁর মৃত্যু হয়) তখন প্রতিবন্ধকের অভাব না থাকলেও ভ্রম হতে দেখা যায়। মনিমরিচ্যাদি ভ্রম তার প্রমাণ।[33]

জয়রাশির আরও প্রশ্ন বিপর্যয় জ্ঞান কি বিষয় হতে উৎপন্ন বিষয়ের স্বভাববাধক বিজ্ঞান উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা করে? অন্য ভাষায় বিপর্যয় জ্ঞান কি জ্ঞানের বিষয় থেকে উৎপন্ন যে বিষয় তার স্বভাবের যা বাধক তাকেই প্রতিবন্ধিত করে? সহজ কথায় বিপর্যয় কি জ্ঞানের বিষয়ের স্বভাব বাধক হয় নাকি স্বভাব বাধকের প্রতিবন্ধক হয়? যদি স্বভাব বাধকই হতো তাহলে তত্ত্বাংশের জ্ঞান পরে আর ইষ্ট বলে গণ্য হতো না।

[33] Sanghavi, P. S and Parikh, Rasiklal C. eds, *Tattvopaplavasimha*, P- 3.

(অথচ ভ্রম জ্ঞানের তত্ত্বাংশের যে কোনো বিপর্যয় হয় না, কেবল প্রকারাংশে বিপর্যয় হয়, তাই তোমরা স্বীকার করো)।

তৃতীয় বিকল্পটিও বিচারসহ নয়। প্রবৃত্তি সাফল্যের কারণে জ্ঞান অব্যভিচারী হয় এমন ব্যাখা মানা যায় না। কার্য সফলতার কারণে প্রত্যক্ষ অব্যাভিচারী হয় এমন কথা বললে প্রবৃত্তি সাফল্যর সঙ্গে ফলের নিয়ত সম্বন্ধ মানতে হয়। এই প্রসঙ্গে জয়রাশির মন্তব্য, যেভাবে স্রকচন্দন বনিতা জলাদিফল লাভ হয় বলে তাদের ফলোপচার বলা হয়েছে ঠিক সেইভাবে যা ফলদায়ক তাই অব্যাভিচারী বলে গণ্য হোক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্রকচন্দন বনিতা প্রভৃতিকে মোক্ষবাদী শাস্ত্রগুলি ত্যাজ্য বলে গন্য করেন। ঐ ত্যাজ্য পদার্থকে ফল হিসাবে গণ্য করে জয়রাশির আপত্তি ঐ ফলের জনক যে জ্ঞান তাও অব্যাভিচারী হোক। আরও কথা প্রবৃত্তি বলতে বোঝায় শরীরনিষ্ঠ প্রযত্নকে। অর্থাৎ কিনা প্রবৃত্তি শরীরগত বিষয়। আর স্পন্দনাদি ক্রিয়া হল সেই প্রবৃত্তির সাফল্য। ফলে স্পন্দনাদি জ্ঞান প্রবৃত্তি সাফল্যরই জ্ঞান, যা জ্ঞানের অব্যাভিচারীতাকে প্রমাণ করে। অথচ স্রকচন্দন বনিতাদির জ্ঞান পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িকের মতে প্রকৃত জ্ঞান নয়।

এই প্রসঙ্গে তত্ত্বপপ্লসিংহকারের আরও জিজ্ঞাসা যে অব্যভিচারিতার কথা পূর্বপক্ষী বলছেন তাকি অবগত না অনবগত?[34] যদি তা অনবগত হয় তাহলে প্রশ্ন যা অবগতই নয় তা যে অব্যাভিচারী সেকথা কিভাবে বলা যায়? বস্তুতঃ যা অবগত নয় তাকে অব্যাবিচারী, ব্যাভিচারী কোনটিই বলা যায় না। আর যদি অব্যাভিচারীতা অবগত বা জ্ঞাত হয়, তাহলে প্রশ্ন তা কিভাবে জ্ঞাত হল? যদি পূর্বপক্ষী বলেন যে ফল জ্ঞানের

---

[34] 'তৎকিম্ অবগতম্, অনবগতং', Sanghavi, P. S and Parikh, Rasiklal C. eds, Tattvopaplavasimha, P-3.

সাহায্যে তা অবগত হয় তাহলে প্রশ্ন কোন ফলপ্রাপ্তির জন্য তা অবগত? যদি উদক প্রাপ্তির বা জল প্রাপ্তির কারণেই জল জ্ঞানের অব্যাভিচারীতা একথা পূর্বপক্ষী বলেন তাহলে জয়রাশির প্রশ্ন ঐ জল প্রাপ্তি বাস্তবে কোন জল প্রাপ্তি? যে জল ইতঃপূর্বে প্রতিভাত হয়েছে সেই জল প্রাপ্তি হেতু, নাকি তদজাতীয় জল প্রাপ্তি হেতু, নাকি দৃষ্ট জলের শ্রেণীতে পরে এমন অন্যকোন জলপ্রাপ্তি হেতু?[35]

প্রথম বিকল্প সম্ভব নয়। কারণ প্রতিভাত জলের বা দৃষ্ট জলের প্রাপ্তি অসম্ভব। পূর্বকালে বৃষ, মহিষ ইত্যাদির সঙ্গে যে জলের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়েছিল সেই জল অর্থাৎ দৃষ্টজল বর্তমানকালে উপজাত অর্থাৎ তরঙ্গ সহকারে গৃহীত হতে পারে না। সহজ কথায় পূর্বকালে দৃষ্ট জল এবং বর্তমানে উপলব্ধ জল যেহেতু এক নয় তাই প্রতিভাত জলের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিকল্প মানলে অর্থাৎ তদজাতীয় জলের গ্রহণ হয় একথা বললে মিথ্যা জল জ্ঞানবশত যেক্ষেত্রে জল পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও তদজাতীয় জলের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হয় এবং সেই জলজ্ঞানকে অব্যাভিচারী বলতে হয়। সেক্ষেত্রে মিথ্যা জ্ঞান অব্যাভিচারী হয়ে পরার আশঙ্কা থেকে যায়।

পূর্বপক্ষীর উদ্দেশ্যে জয়রাশির প্রশ্ন যে তাঁরা কি মনে করেন যেকালে, যেদেশে, যেবস্তু প্রতিভাত হয় সেদেশে, সেকালে, সেবস্তুর গ্রহন হলেই জ্ঞান অব্যাভিচারী হয়? যদি তাই হয় তাহলে যেদেশে, যেকালে, যেজল দৃষ্ট বা প্রতিভাত হয় কেবল সেদেশে, সেইকালে, সেজলের গ্রহণ হলেই তাকে অব্যাভিচারী বলা যাবে। আর যদি সেইদেশে, সেইকালে, সেইজলের গ্রহণ না হয় তাহলে জ্ঞান (জলজ্ঞান) হবে ব্যাভিচারী। এরকম নীতি মানলে ক্ষণস্থায়ী বস্তু বা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি বিষয়ে অব্যাভিচারী জ্ঞান কখনও

[35] Sanghavi, P. S and Parikh, Rasiklal C. eds, Tattvopaplavasimha, P- 3.

হতে পারবে না। কারণ ক্ষণস্থায়ী বস্তু একটি ক্ষণের পরে ধ্বংস হয়ে যায়। সূর্য, চন্দ্র, প্রভৃতিও কোন স্থায়ী বস্তু নয় – অনবরত পরিবর্তনশীল আলোকধারা। ফলে বিনাশশীল বা পরিবর্তনশীল ঐসব বস্তুর ক্ষেত্রে যে দেশে-কালে যে বস্তুর জ্ঞান হয় সেই দেশ-কালাবচ্ছিন্ন সেই বস্তুর জ্ঞান হতে পারে না, যেহেতু বস্তুটির গ্রহণ কাল তার দর্শন কাল থেকে আলাদা। শুধু ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনশীল বস্তুই বা কেন, সেক্ষেত্রে পূর্বদৃষ্ট জলের গ্রহণও সম্ভব হবে না। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জলের পরিবর্তন হয় তেমনি যেদেশে জল দৃষ্ট হয়েছিল সেই দেশেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যেদেশে, যেকালে জলের জ্ঞান হয়েছিল সেদেশে, সেকালে সেই জল গ্রহণের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ফলে জল গ্রহণের উচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ জল গ্রহণ মাত্রই ভ্রম- এমন সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

নাগার্জুন কর্তৃক প্রমাণ ও প্রমেয়ের ধারণা খণ্ডন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ভারতীয় দর্শনের নানা দার্শনিকরা নানা উপায়ে জ্ঞানের দাবীর খণ্ডন করেছিলেন। আর এই দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন চার্বাক দর্শনের মধ্যমণি জয়রাশি ভট্ট, শ্রীহর্ষ এবং সর্বশূন্যবাদী নাগার্জুন। অবশ্য যে অর্থে জয়রাশি ভট্টকে সংশয়বাদী বলা হয় ঠিক সেই অর্থে মাধ্যমিক দর্শনের মধ্যমণি নাগার্জুনকে সংশয়বাদী বলা যায় কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে সঠিক অর্থে নাগার্জুনকে দার্শনিক সংশয়বাদী বলা না গেলেও তিনি যে একজন জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদী (epistemic sceptic) তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর 'বৈদল্যপ্রকরণ' এবং 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' গ্রন্থ দুটি মূলত জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। নাগার্জুন তাঁর 'মূলমধ্যমককারিকা', 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' এবং 'বৈদল্যপ্রকরণ' গ্রন্থে নানা যুক্তির দ্বারা নৈয়ায়িকের পদার্থতত্ত্বের বিরোধিতা করেন। বিশেষত তিনি তাঁর 'বৈদল্যপ্রকরণ' গ্রন্থে ২-২১ নং কারিকাতে এবং 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' গ্রন্থের ৩১-৫১ নং কারিকাতে প্রমাণবাদীদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি দেখিয়ে প্রমাণ, প্রমেয়ের বিভাজনটি যে অর্থহীন তা প্রমাণ করেন।

ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণ এবং প্রমেয়ে আস্থাশীল। প্রমাণ বলতে বোঝায় যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে। আর প্রমেয় হল যথার্থ জ্ঞানের বিষয়। যদিও ভারতীয় দর্শনের সকল দার্শনিকরা প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে সহমত নন। কোনও কোনও দার্শনিক প্রত্যক্ষের ন্যায় একটি প্রমাণ স্বীকার করেন, আবার কোনও কোনও

দার্শনিক প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য, সম্ভব, চেষ্টা এবং প্রতিভার মতো দশটি প্রমাণও স্বীকার করেন। প্রমাণের ন্যায় প্রমেয়ের ক্ষেত্রেও দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। যেখানে কোনও কোনও দার্শনিক সম্প্রদায় একটিমাত্র সত্তা (monism) স্বীকার করেন, আবার কিছু সম্প্রদায় দুটি সত্তা (dualism) স্বীকার করেন, আবার এমন কিছু সম্প্রদায় আছে যারা সত্তার বহুত্ব (pluralism) স্বীকার করেন। তবে প্রমাণ, প্রমেয়ের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও ভারতীয় দর্শনের প্রায় অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমাণ, প্রমেয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সহমত লক্ষ করা যায়। প্রমাণ, প্রমেয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে নৈয়ায়িকরা এর ব্যতিক্রম নয়। মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়দর্শনে'র প্রথম সূত্রে ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই প্রমাণ, প্রমেয়ের কথা উল্লেখ করেন।[1] প্রমাণ হল সকল যথার্থ জ্ঞানের এবং প্রবৃত্তি সাফল্যের আবশ্যিক শর্ত।[2] ফলে প্রমাণের অনুপস্থিতিতে কখনই যথার্থ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। আর যথার্থ জ্ঞান বলে যদি কিছু না থাকে, তাহলে কখনও কোনও বস্তুর প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব নয়। নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ কেবলমাত্র ঘট, পটের মতো জাগতিক বস্তু সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়ই নয়, বরং আত্মা, মোক্ষ, ঈশ্বর ইত্যাদি অদৃষ্টার্থ সত্তারও জ্ঞানলাভের উপায়। আবার প্রমাণ হল এমন একটি উপায় যার দ্বারা প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান হলে মুক্তি সম্ভব। আর এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় দর্শনে, বিশেষত ন্যায়দর্শনে প্রমাণ প্রমেয়ের গুরুত্ব কতখানি।

---

[1] 'প্রমাণ-প্রমেয়...তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ', *ন্যায়সূত্র*- ১.১.১।

[2] The *Nyāya-sutra* of Gautama, Ganganāth Jhā, ed, vol.1, p.1.

৪.১. বৈদল্যপ্রকরণ ও নাগার্জুনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়

শুরু থেকেই ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণ এবং প্রমেয়ের বিভাজনে আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ এবং প্রমেয়ের এই বিভাজনের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক সম্প্রদায়কে তীব্র আপত্তি করতে দেখা যায়। এই মাধ্যমিক সম্প্রদায় হল মূলত শূন্যবাদী। আর এই শূন্যবাদ অনুসারে যেমন কোনো কিছু সৎ নয়, অসৎও নয়, সদাসদ নয়, তেমনি আবার কোনও কিছু সদাসদ্ বিলক্ষণও নয়। তাঁদের মতে সবকিছুই শূন্য। আর এই 'শূন্য' বলতে তাঁরা স্বভাবশূন্যকে নির্দেশ করেন। শূন্যবাদী নাগার্জুন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে সবকিছু যে স্বভাবশূন্য তা প্রমাণ করেন। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটিকে আবার প্রসঙ্গ পদ্ধতিও বলা হয়। যদিও নাগার্জুন একমাত্র দার্শনিক নন যিনি এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন, কারণ নাগার্জুনের পূর্বে এমনকি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে সঞ্জয় (6th century B.C) নামক একজন দার্শনিক ছিলেন, যিনি এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন।[3] নাগার্জুন তাঁর 'বৈদল্যপ্রকরণ' গ্রন্থে প্রমাণ, প্রমেয় এই দুটি ধারণার পরস্পর সাপেক্ষতা প্রদর্শন করে দুটি ধারণাই যে অর্থহীন সেটি প্রমাণ করতে গিয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করেন।

প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তা অকারণ। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেয়ের ধারণা বিমিশ্র (confused)। 'প্রমাণ' বলতে বোঝায় প্রমা জ্ঞানের করণকে। আর 'প্রমেয়' বলতে বোঝায় প্রমা জ্ঞানের বিষয়কে। এখন একটি প্রমাণ সেই পর্যন্ত প্রমাণ হতে পারে, যে পর্যন্ত প্রমেয় বিষয় থাকে। আবার, প্রমেয় সেই পর্যন্ত প্রমেয় হতে পারে যে পর্যন্ত প্রমাণ থাকে। সহজ কথায় প্রমেয় সাপেক্ষে যেমন একটি প্রমাণ

[3] *Logical and Ethical Issues*, Bimal Krishna Motilal, ed. P.55.

'প্রমাণ' বলে গণ্য হয়, তেমনি প্রমাণ সাপেক্ষে প্রমেয়ের প্রমেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। একজন ব্যক্তি পিতা বলে গণ্য হতে পারেন কেবল অন্য একব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধের ভিত্তিতে যাকে ঐ ব্যক্তির 'পুত্র' বা 'সন্তান' বলা যায়। একই ভাবে একজন পুত্র 'পুত্র' বলে বিবেচিত হয় একজন পিতার (মাতার) সঙ্গে সম্বন্ধের ভিত্তিতে। প্রমেয়ের কারণেই প্রমাণ সিদ্ধ হয়, প্রমাণ হিসাবে। অনুরূপভাবে, প্রমেয় প্রমেয় হিসাবে গণ্য হতে পারে প্রমাণের কারণে। কাজেই প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় প্রমেয়ের প্রমেয়। আবার প্রমেয় হয়ে দাঁড়ায় প্রমাণের প্রমাণ। প্রমাণবাদীরা প্রমেয়কে সাধ্য এবং প্রমাণকে সাধন বলে থাকেন, যেহেতু প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রমাণের প্রমাণত্ব প্রমেয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রমাণ সাধ্য এবং প্রমেয়কে সাধন বলতে হয়। উভয়েই যুগপদ সাধন ও সাধ্য হওয়ায় উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। এমতাবস্থায় প্রমাণ আর প্রমেয়ের মধ্যে তফাৎ করা যায় না।[4]

যেহেতু প্রমাণ ও প্রমেয় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাই তাদের স্বয়ং সৎ বা নিজে নিজে অস্তিত্বশীল বলা যায় না। যদি প্রমাণ নিজে নিজে অস্তিত্বশীল হতো তাহলে তা প্রমেয় নির্ভর হতো না, একইভাবে যদি প্রমেয় স্বয়ং সৎ হতো তাহলে তা প্রমাণ জন্য হতো না। উভয়ের মধ্যেই জন্যজনকভাব থাকায় কোনোটিই স্বনির্ভরভাবে সিদ্ধ নয়। প্রমাণ-প্রমেয় যেহেতু একে অন্যের উপর নির্ভর তাই তাদের সৎ বলা যায় না। কারণ যা সৎ তা অন্য নির্ভর নয়। এমন কি অন্য নির্ভর হওয়ায় তাদের অসৎও বলা যায় না। কারণ যা অসৎ তা অলীক, যা আকাশ কুসুমের মতো অলীক তা অন্য নির্ভর

---

[4] Nāgārjuna, Vaidalyaprakaraṇa Trans by Tola Fernando and Dragonetti Carmen. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, পৃ-৫৮।

হবে কীভাবে? আর যা সৎও নয় অসৎও নয় তার সৎ- অসৎ উভয় হওয়ার কোনও সম্ভবনাই নেই। যা সৎ, অসৎ, সদাসৎ নয় তাকে শূন্যই বলতে হয়।[5] এইভাবে প্রমাণ ও প্রমায়ের শূন্যতা সিদ্ধ হয়।

পূর্বপক্ষী এইখানে বলতে পারেন যে প্রমেয় সিদ্ধির জন্যই প্রমাণের স্বীকৃতি। তুলাদণ্ড ছাড়া যেমন কোনও কিছুর গুরুত্বের পরিমাপ হয় না, তেমনি প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রমেয়ের সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ কিনা পূর্বে প্রমাণ সিদ্ধ না হলে তার দ্বারা প্রমেয়ের সিদ্ধি হতে পারে না। তাই প্রমেয় সিদ্ধির পূর্ব শর্ত হিসাবে প্রমাণের সিদ্ধি আবশ্যক। পূর্বপক্ষীর এই যুক্তির উত্তরে নাগার্জুন প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে প্রমাণের দ্বারা পূর্বপক্ষী প্রমেয় সিদ্ধ করতে উদ্যত সেই প্রমাণের নিজের সিদ্ধি হয় কীভাবে?

এখানে পূর্বপক্ষী দুটি বিকল্প গ্রহণ করতে পারেন। তিনি এমন কথা বলতে পারেন যে প্রমাণ-প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, তিনি এমন কথা বলতে পারেন যে প্রমা প্রমাণান্তর নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ। দুটি বিকল্পের কোনোটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে নাগার্জুন মনে করেন না।[6] প্রথমত, প্রমাণ, যা কিনা প্রমেয়ের সাধন, যদি অন্য প্রমাণের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়, তাহলে তার পরিণতি হবে অনবস্থা। প্রমাণ ক যদি খ দ্বারা সিদ্ধ হয়, খ- গ দ্বারা এবং গ- ঘ দ্বারা তাহলে প্রমাণের অন্য সাপেক্ষতা চলতেই থাকবে। এই অবস্থায় কোনও প্রমাণই সিদ্ধ হবে না। দ্বিতীয় বিকল্পটিও বিচারসহ নয়। প্রমাণ কোনওরূপ প্রমাণ ছাড়াই সিদ্ধ এমন কথা বললে প্রশ্ন উঠবে কী কারণে? প্রমেয়ের সিদ্ধির জন্য প্রমাণ স্বীকার করে প্রমাণকে স্বয়ং সিদ্ধ বললে তার বিশেষ কারণ দেখাতে

---

5 তদেব, পৃ-৫৯।

6 তদেব, পৃ-৫৯-৬০।

হবে। তাছাড়া প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি হয়- এই হল পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত। যদি প্রমাণ স্বয়ং প্রমাণ নিরপেক্ষ ভাবে সিদ্ধ হয় তাহলে ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধ হবে, কেননা প্রমাণও একপ্রকার অর্থ তথা প্রমেয়। সব অর্থ বা প্রমেয়ের সিদ্ধি যদি প্রমাণ সাপেক্ষ হয় তাহলে প্রমেয় হিসাবে প্রমাণের সিদ্ধিও অন্য প্রমাণ নির্ভর হতে বাধ্য। সুতরাং হয় পূর্বপক্ষীকে প্রমাণের প্রমাণ স্বীকার করতে হবে, নতুবা 'প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি হয়' – এই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে হবে।

এখন পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে প্রমাণের প্রমাণ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন । এমন বলা যেতে পারে যে প্রমাণগুলি স্বয়ং সিদ্ধ। সেগুলি দীপশিখার সদৃশ। দীপশিখা অন্য বিষয়কে প্রকাশ করে এবং নিজেকেও প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে প্রমাণগুলি যেমন প্রমেয় বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করে তেমনি নিজেদেরও প্রতিষ্ঠা করে। দীপশিখার অস্তিত্ব যেমন অন্য দীপশিখার ওপর নির্ভর করে না তেমনি প্রমাণের প্রতিষ্ঠা প্রমাণান্তরের ওপর নির্ভর করে না। ফলে অনবস্থার আপত্তিও উত্থাপিত হয় না।

নাগার্জুনের মতে, দীপশিখার যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ পূর্বপক্ষী করেন তা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নয়। এমন কথা বলা যায় না যে দীপশিখা বস্তুকে প্রকাশ করে। দীপশিখা বিষয়কে প্রকাশ করে- একথার অর্থ হতে পারে বস্তু যে তমসা বা অন্ধকার দ্বারা আবৃত থাকে সেই অন্ধকার নিরাকরণের দ্বারা তা বিষয়কে প্রকাশ করে। কিন্তু দীপশিখার পক্ষে অন্ধকারের নিরাকরণ সম্ভব নয়। কারণ দীপশিখা অন্ধকারের নিরোধ করতে পারে দুই ভাবে – (ক) অন্ধকারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, (খ) অন্ধকারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিযুক্তভাবে। কিন্তু কোনও ভাবেই দীপশিখা অন্ধকার নিরসন করতে পারে না। প্রথমত,

আলো ও অন্ধকার হল পরস্পর বিরুদ্ধ। দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে সংযোগ হতে পারে না। কাজেই, আলো অন্ধকারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তার নিরসন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, আলো অন্ধকারের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত না হয়েও তা নিরসন করতে পারে না। কোনও শরীরের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে তরবারী যেমন তা ছেদন করতে পারে না, তেমনি সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে আলো অন্ধকার নিরসন করতে পারে না। সুতরাং আলো কোনও বস্তুকে প্রকাশ করে এমন কথা বলা যায় না।[7]

এখানে প্রতিযুক্তি হিসাবে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন অসম্বদ্ধ আলো অন্ধকারের নাশক হতে পারে। কারণ কোনও সম্বন্ধ ছাড়াই একটি বস্তু দূরস্থিত অপর বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেমন- পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের ওপর গ্রহের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দূরদূরান্তের গ্রহ যদি সম্বন্ধ ছাড়াই পার্থিব জীবের উপর প্রভাব খাটাতে পারে তাহলে দূরে অবস্থানকারী যে আলো তাই বা অন্ধকারের নাশক হবে না কেন? সুতরাং অন্ধকারের নাশক হওয়ার জন্য আলোককে অন্ধকার-সম্বদ্ধ হতেই হবে - এমন কথা বলা যায় না।

পূর্বপক্ষীর এই উপমাটিও যথাযথ নয় বলে নাগার্জুন মনে করেন। তিনি স্বীকার করেন যে দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তের মতো পার্থিব জীবেরা গ্রহের প্রভাবে দারুণভাবে প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু, কেবলমাত্র তারাই ঐভাবে প্রভাবিত হয় যারা দেহযুক্ত। অগ্নি, রজ্জু, জল, ব্যাধি, সরীসৃপ, মহামারী ইত্যাদির প্রভাব যেমন দেহধারীদের ওপর পরে তেমনি দূরস্থিত গ্রহের প্রভাবও শরীরী প্রাণীর উপরেই খাটে। অন্ধকারের কোনও শরীর না

[7] তদেব, পৃ-৬০-৬১।

থাকায় তার ওপর দূরস্থিত আলোকের প্রভাব খাটতে পারে না। সুতরাং গ্রহের সঙ্গে আলোর তুলনা অযৌক্তিক। তাছাড়া যদি একথা সত্য হয় যে দূরস্থিত আলো অন্ধকারের নাশক হতে পারে, তাহলে যেকোনো আলোকের দ্বারা যেকোনো অন্ধকারের নাশ সম্ভব হবে। ফলে পর্বতে, অরণ্যে থাকা বহু দূরবর্তী অন্ধকারের বিনাশ হবে, এবং কার্যত পৃথিবীর যাবৎ অন্ধকারের উচ্ছেদ হয়ে যাবে।[৪] কিন্তু এরকম ঘটনা কখনোই ঘটতে দেখা যায় না। আরও কথা যেখানে আলো থাকে সেখানে অন্ধকার থাকে না। অন্ধকার কেবল সেখানেই থাকে যেখানে আলোকের অভাব থাকে। এই সকল কারণে অনেকেই অন্ধকারকে আলোকের অভাব হিসাবে গণ্য করেন। এখন যা অভাবস্বরূপ কোনও কিছুই তার নাশক হতে পারে না। সুতরাং আলোকের দ্বারা অন্ধকারের নাশ অসম্ভব।

কাজেই দেখা যাচ্ছে আলোক অন্যকে বা বিষয়কে প্রকাশ করে এমন কথা বলা যায় না। এমনকি আলোক নিজেকে প্রকাশ করে এমন দাবিও সমীচীন নয়। সচরাচর আলোককে স্বয়ং প্রকাশ বলে অভিহিত করা হয় কিন্তু আলোক নিজেকে প্রকাশ করবে কীভাবে? একমাত্র অন্ধকার দূর করেই আলো নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আলোকের নিজের মধ্যে অন্ধকার থাকে না। যে স্থানে আলোক অবস্থান করে সেই স্থানেও অন্ধকার থাকে না। সুতরাং আলোক কীভাবে বা কাকে নাশ করে নিজেকে প্রকাশ করবে? যদি ধরে নেওয়া হয় যে আলোক স্বয়ং প্রকাশ তাহলে অন্ধকার, যা আলোকের বিপরীত স্বভাব, হবে স্বয়ং আবৃত। যা স্বয়ং আবৃত তা কখনোই দৃষ্ট হতে পারে না। অথচ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হতে দেখা যায়। সুতরাং আলোককে স্বয়ং প্রকাশ বলা যায় না। এইভাবে প্রমাণিত হয় যে আলোক যেমন অন্য কোনও বস্তুকে প্রকাশ

[৪] তদেব, পৃ-৬১।

করতে পারে না, তেমনি নিজেকেও প্রকাশ করতে পারে না।[9] সুতরাং আলোকের মতো প্রমাণ, প্রমেয়কে প্রতিষ্ঠা করলেও নিজে স্বয়ং সিদ্ধ - এরকম বলা চলে না।

প্রমাণ যে স্বয়ং বা পরতঃসিদ্ধ হতে পারে না তা প্রদর্শনের পর নাগার্জুন প্রমাণ-প্রমেয় দ্বৈততার খণ্ডনে একটি অভিনব যুক্তির অবতারণা করেন। তিনি আপত্তি করেন যে প্রমাণ-প্রমেয় সম্বন্ধ কোনও কালেই সিদ্ধ হতে পারে না। এই আপত্তি ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বিষয়ক আপত্তি নামে পরিচিত। এই আপত্তিতে দেখানো হয় প্রমাণ-প্রমেয়ের পূর্ববর্তী বা অনুবর্তী হতে পারে না, এমনকি সমকালে বা যুগপদ সিদ্ধ হতেও পারে না। প্রথমত, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালে সিদ্ধ এমন কথা বলা যায় না। কারণ প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্বকালে সিদ্ধ হয় তাহলে তা কীসের প্রমাণ বলে গণ্য হবে। কোনও প্রমেয় না থাকলে প্রমাণটি কোন বিষয়ে প্রমা জ্ঞানের জনক হবে। প্রমেয়াভাবে প্রমাণ আর 'প্রমাণ' হতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, প্রমাণ প্রমেয়ের অনুবর্তী হতে পারে না। প্রমেয় সিদ্ধির পরে যদি প্রমাণ সিদ্ধি হয় তাহলে প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। প্রমাণের পূর্বে প্রমেয়ের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রমাণ স্বীকার নিরর্থক হয়ে পরবে। তাছাড়া প্রমেয়ের কালে প্রমাণ অসৎ এমন কথা বলা যায় না। যা অসৎ তার কার্যও অসৎ। আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ যেমন কোনও কিছুর জনক হতে পারে না, তেমনি অসৎবস্তু সৎ বস্তুর জনক হতে পারে না।

এই উভয় সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষে পূর্বপক্ষী হয়তো প্রমাণ ও প্রমেয়ের যৌগপদ্য সমর্থন করবেন কিন্তু নাগার্জুনের কাছে এই অবস্থান যুক্তিসহ নয়।

---

[9] তদেব, পৃ-৬২-৬৩।

কারণ যারা যুগপদ সৎ তাদের মধ্যে কোনও কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতে পারে না। গবাদি পশুর দুই শৃঙ্গের মধ্যে যেমন কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে না, তেমনি প্রমাণ ও প্রমেয় যদি যুগপদ সিদ্ধ হয় তাহলে তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধও সম্ভব হয় না।[10] বিশেষত পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক কারণকে কার্য-পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে মানেন। সুতরাং কালগতভাবে যাদের মধ্যে পূর্বাপরতা নেই তাদের মধ্যে কারণকার্য সম্বন্ধ স্বীকৃত হতে পারে না। এই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে পূর্বপক্ষী অন্য যুক্তির অবতারণা করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন প্রতিষেধ মাত্রই প্রতিষেদ্ধ বিষয়ের অপেক্ষা রাখে। যা অলীক বা অসিদ্ধ তার প্রতিষেধ হয় না, একমাত্র প্রসিদ্ধেরই প্রতিষেধ হয়। যদি প্রমাণ ও প্রমেয় পূর্বকালে, উত্তরকালে বা সমকালে কোনও কালেই সিদ্ধ না হয়, তাহলে তার অস্বীকৃতি বা প্রতিষেধ অসম্ভব হয়ে পরে। অর্থাৎ কিনা যে যুক্তিতে নাগার্জুন প্রমাণ-প্রমেয় সম্বন্ধ অস্বীকার করেন, সেই একই যুক্তিতে প্রতিষেধ এবং প্রতিসিদ্ধের সম্বন্ধটিও অস্বীকৃত হবে। যে কারণে প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালে, উত্তরকালে বা সমকালে সিদ্ধ হতে পারে না সেই একই যুক্তিতে প্রতিষেধও প্রতিষেদ্ধের পূর্ববর্তী, অনুবর্তী বা যুগপদ হতে পারবে না। ফলে প্রতিষেধের উচ্ছেদ হয়ে যাবে। প্রতিষেদ্ধ প্রমাণ ও প্রমেয় সিদ্ধ না হওয়ার কারণে প্রতিষেধও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, যদি প্রতিষেধ স্বীকার করতে হয় তাহলে প্রতিষেদ্ধ বিষয় হিসাবে প্রমাণ-প্রমেয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।[11] যদি বলা হয় সাধারণ ভাবে প্রতিষেধ প্রতিষেদ্ধ বিষয়ের অপেক্ষা রাখে ঠিকই কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রতিষেধ প্রতিষেদ্ধ বিষয়ের অপেক্ষা রাখে না,

---

[10] তদেব, পৃ-৬৩-৬৪।

[11] তদেব, পৃ-৬৪।

তাহলে কেন ঐ ব্যতিক্রমের স্বীকার, তার কারণ দর্শাতে হবে। সুতরাং নাগার্জুনের কাছে দুটি বিকল্প খোলা থাকে। প্রথমত, প্রতিষেদ্ধ বিষয়কে অস্বীকার করে প্রতিষেধকে অস্বীকার করা। দ্বিতীয়ত, প্রতিষেধকে স্বীকার করে প্রতিষেদ্ধ বিষয়ের সত্তাকে স্বীকার করা।

পূর্বপক্ষীর এই আপত্তির উত্তরে নাগার্জুন বলেন যে পূর্বপক্ষীর এই বক্তব্য সংগতিপূর্ণ নয়। কোনওকিছুকে পূর্বে সৎ বলে মেনে নেওয়ার পর তার সত্তার সপক্ষে আর যুক্তি আরোপ করা যায় না। বক্তব্য এই, পূর্বপক্ষী ইতঃপূর্বে (তর্কের খাতিরে) ধরে নিয়েছেন যে প্রমাণ-প্রমেয় সম্বন্ধ অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনও কালেই সিদ্ধ হতে পারে না। কাজেই তিনি আর প্রমাণ-প্রমেয়কে সৎ বলে দাবি করতে পারেন না। তেমন করলে তার বক্তব্য হবে অসঙ্গতিপূর্ণ। এখানে নাগার্জুন পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে যে আপত্তি করেন সেটি একটি যৌক্তিক আপত্তি। তিনি দেখাতে চান পূর্বপক্ষী কর্তৃক উথ্থাপিত পক্ষ যৌক্তিকভাবে দোষদুষ্ট। কারণ তার পূর্বের দাবি ও পরের দাবি একে অন্যের বিরোধী। পূর্বে যাদের অসত্তা তিনি মেনে নিয়েছেন পরে তাদেরই সত্তা দাবি করেছেন তিনি।[12]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, মধ্যমক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে (যা অনুসারে প্রমাণ ও প্রমেয় পরস্পরের পূর্বকালে, পরকালে কিংবা যুগপদ সিদ্ধ হতে পারে না) যুক্তি আরোপ করতে গিয়ে পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক এমন কথা বলেন যে প্রমাণ ও প্রমেয় যদি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোনও কালেই সিদ্ধ না হয় তাহলে প্রমাণ-প্রমেয়ের নিষেধ

[12] তদেব, পৃ-৬৫।

বা প্রতিষেধও অসিদ্ধ হবে। এখানে নাগার্জুনের বক্তব্য হল, নৈয়ায়িক যখন একবার প্রমাণ, প্রমেয়কে অসিদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন তখন সেখানে সব তর্কের অবসান হয়ে গেছে। কাজেই পরে আর ঐ অসিদ্ধ পদার্থকে সিদ্ধ করার লক্ষে কোনও যুক্তি আরোপ করতে তিনি পারেন না। কেননা এরকম যুক্তি আরোপ আত্মবিরোধী বা নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক।[13]

'অসৎ-এর প্রতিষেধ হয় না'- পূর্বপক্ষীর এই দাবি যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে নাগার্জুন মনে করেন। তাঁর মতে যা অস্তিত্বশূন্য তারও প্রতিষেধ সম্ভব। বিশেষত একটি ধারণার ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিষেধ মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ একটি ধারণা যখন প্রতিসিদ্ধ হয় তখন সেই ধারণা অনুযায়ী কোনও বস্তুর অস্তিত্ব বাস্তবে থাকে না। অগভীর একটি নদীর সামনে দাঁড়িয়ে যখন কেউ বলেন 'নদী গভীর নয়' তখন তিনি আসলে বাস্তবে 'গভীর নদী' প্রত্যয়টির কোনও দৃষ্টান্ত যে নেই তা স্বীকার করেন মাত্র। বা যিনি ঐ গভীর নদীকে গভীর বলে কল্পনা করেন তাঁর ভ্রান্ত ধারণা দূর করেন মাত্র। সুতরাং গভীর নদী অসৎ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিষেধ বা অস্বীকৃতি যেমন হতে পারে তেমনি প্রমাণ-প্রমেয় অসৎ হলেও তাদের প্রতিষেধ সম্ভব হতে পারে। বস্তুগতভাবে যা অসৎ ধারণাগত স্তরে (at the conceptual level) তার অস্বীকৃতির মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই। সুতরাং যে প্রমাণ-প্রমেয় বস্তুগত স্তরে অবিদ্যমান, ধারণাগত ভাবে তাদের অস্বীকার আত্মঅসংগত নয়।

---

13 তদেব, পৃ-৬৫-৬৬।

পূর্বপক্ষী প্রমাণ সিদ্ধির উপায় হিসাবে প্রমা জ্ঞানের শরণাপন্ন হতে পারেন। তাঁর যুক্তি হতে পারে এই যে, যেহেতু প্রমা আছে সেহেতু প্রমাণও আছে।[14] প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সিদ্ধ না হলে প্রত্যক্ষাদি প্রমা জ্ঞানাদি সম্ভব হতে পারে না। প্রথমক্ষণে প্রত্যক্ষ কর্তার দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় গৃহীত হয়, এই প্রত্যক্ষ মূলক জ্ঞান আসলে বিষয়ের নিছক প্রকাশ। বিষয়ের এই গ্রহণ বা প্রকাশকালে তার সত্যাসত্য বা যাথার্থ্যের নির্ধারণ হয় না, পরমুহূর্তে পূর্ব প্রত্যক্ষকালে যে বিষয় গৃহীত হয়েছে, তার ধর্ম বা গুণের গ্রহণ হয় এবং তখনই বস্তুটি কী করতে পারে বা পারে না তার উপলব্ধি হয়। তারপর ঐ বস্তু দ্বারা উৎপন্ন যে ক্রিয়া সে সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়। যেমন জলের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রথমে জলের প্রকাশ হয় কিন্তু তা কি সত্যি জল নাকি মরীচিকা তার নিশ্চয় হয় না। ঐ প্রত্যক্ষ সঠিক নাকি ভ্রান্ত তার নিশ্চয় হয় যখন ফলজ্ঞান হয়। যখন ঐ জল তৃষ্ণা নিবারণে সক্ষম হয় তখনই তা যে সত্যসত্যই জল তার নিশ্চয় হয়। আমার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই আমি উপলব্ধি করতে পারি যে, প্রথমে দৃশ্যমান বস্তুটি যেভাবে প্রতিভাত হয়েছিল তা সঠিকই ছিল। অর্থাৎ কিনা তা যে সত্য সত্যই তৃষ্ণা নিবারণের সামগ্রী সে প্রত্যয় আমার হয়। বাস্তব ক্রিয়ার উপলব্ধি থেকেই ধর্মের বাস্তবতা সম্বন্ধে প্রত্যয় হয় আমার। আর এই প্রত্যয় যথার্থ যেহেতু তা ফলদায়ক বা বস্তু স্বরূপের উপলব্ধি দানকারী।

এইভাবে প্রায়োগিক পরীক্ষার মাধ্যমে বস্তুর ধর্ম বা গুণ বিষয়ে জ্ঞানের যথার্থতা নিশ্চয় হয় বলে পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িকরা দাবি করেন। যে জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশ দিয়ে শুরু হয়েছিল একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার যথার্থতা চূড়ান্ত হয়। যথার্থ জ্ঞানের এই

[14] তদেব, পৃ-৬৬-৬৭।

প্রক্রিয়ার দ্বারাই একথা প্রমাণিত হয় যে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা যেমন রয়েছে তেমনি তা লাভের উপায় বা প্রমাণ রয়েছে, যা ঐ প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তিকে সম্ভব করে। অন্য ভাষায় প্রত্যক্ষাদি যেহেতু যথার্থ জ্ঞানের জনক অতএব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হিসাবে গণ্য।

পূর্বপক্ষীর এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব নিরাকৃত হয়েছে কারিকা ১৮ তে। পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি নাগার্জুনের মতে, প্রমাণের সত্তা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও প্রমেয়র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় তা ব্যর্থ।[15] তিনি বলেন যদি এটা ধরেও নেওয়া যায় যে প্রমাণ আছে তথাপি এটা প্রতিষ্ঠা হয় না যে প্রমেয় রয়েছে । পূর্বপক্ষীর কাছে তার প্রশ্ন এখানে কোন্‌টিকে তিনি প্রমেয় বলবেন? যদি মেনে নেওয়া যায় যে, প্রত্যক্ষাদি রয়েছে তার থেকে একথা প্রতিষ্ঠিত হয় কি যে ঐ প্রত্যক্ষাদির বিষয় হিসাবে কোনও কিছু আছে? একটি ঘট প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র বিবেচনা করা যাক। এই প্রত্যক্ষের বিষয় বা প্রমেয় বস্তুত পক্ষে কোন্‌টি? যদিও এই প্রত্যক্ষটি ঘটের প্রত্যক্ষ তথাপি প্রত্যক্ষের বিষয়টি ঘট হতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয় যাকে গ্রহণ করে তা ঘট নয়, তা আসলে ঘটের ধারণা, যা মনে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ যেহেতু একটি মানসিক প্রক্রিয়া তাই তার বিষয় কোন মানসিক পদার্থই হবে। এভাবে প্রত্যক্ষ এবং তার বিষয় দুই মন জগতের ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়টি পরিস্ফুট করতে গিয়ে পর্বতে অগ্নি অনুমানের উপমা ব্যবহার করেন নাগার্জুন। তিনি দেখান, যখন পর্বতে ধূম দেখে কেউ অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করেন তখন তাঁর অনুমানের বিষয় হয় যে অগ্নি, সেই অগ্নি সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না।

---

[15] তদেব, পৃ-৬৭-৬৮।

যে অগ্নির অনুমান তিনি করেন তা তাঁর মনের বিকার মাত্র, বাস্তব অগ্নি নয়। অন্য ভাষায় বললে যার অনুমান তিনি করেন তা মনবহির্ভূত কোনও কিছু নয়। একইভাবে যখন কোনও বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় তখন মনবহির্ভূত কোনও কিছুর প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের বিষয় হিসাবে ঘটাদি যে সব মনবহির্ভূত বস্তুর দাবি পূর্বপক্ষীরা করেন সেগুলো বাস্তবে মনবহির্ভূত কোনও কিছু নয়। এমতাবস্থায় প্রত্যক্ষের বিষয় বা প্রমেয় বস্তুতপক্ষে কী তা পূর্বপক্ষীকে বলতে হবে। স্পষ্টতই তা মনবহির্ভূত কোনও কিছুই নয়। সুতরাং প্রমাণের মতো প্রমেয় বলে কিছু আছে এমন কথা তিনি বলতে পারেন না।

এখানে পূর্বপক্ষী হয়তো ঘটের ধারণা বা প্রতিরূপকে প্রমাণ বলে গণ্য করে ঘটকে প্রমেয় বা প্রত্যক্ষের বিষয় হিসাবে ব্যাখ্যা করবেন। সেক্ষেত্রে নাগার্জুনের উত্তর হল ঘটকে যেমন প্রমেয় বলা যায় না, তেমনি প্রমা বলা যায় না। ঘট আসলে এখানে সেই প্রত্যয় বা সহকারী কারণগুলির একটি যাকে বাদ দিয়ে ঘট জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যেমন ঘট জ্ঞানের ক্ষেত্রে কারণ হয় তেমনি ঘটও কারণ হয়। ইন্দ্রিয়াদি সহকারে ঘট, ঘট জ্ঞানের বা ঘটের ধারণার জনক হয়ে থাকে। সুতরাং ঘট বলতে সেই ধারণায় বিশ্বাসকে বোঝায়, যে ধারণা আমাদের মনে উৎপন্ন হয়। এমতাবস্থায় ঘটের ধারণাকে প্রমাণ বলে বাস্তব ঘটকে প্রমেয় বলা অর্থহীন বলে নাগার্জুন মনে করেন।[16]

---

[16] তদেব, পৃ-৬৮।

ঘটের ধারণা যে প্রমাণ হতে পারে না সেই সিদ্ধান্ত যে যুক্তির ওপর নির্ভর তা এরকম - মনে আবির্ভূত ঘটের যে ধারণা তা প্রমাণ হতে পারে না। কারণ, যদি তা প্রমাণ হয় তাহলে ঘট হবে তার প্রমেয়- সেই ঘট যা ঘটের যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তিতে একটি কারন ছাড়া কিছু নয়। বাস্তবে ঘট প্রমেয় হতে পারে না, কেননা তা ইন্দ্রিয়, আলো প্রভৃতি সহকারীর মতো ঘট জ্ঞানের উৎপত্তিতে একটি শর্ত বা প্রত্যয় ছাড়া কিছু নয়- যা জ্ঞাতার মনে ঘটের ধারণা জাগিয়ে তোলে। ঘট, ঘট জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ হয় বলে যদি ঘটকে প্রমেয় বলা হয়, তাহলে একই যুক্তিতে অন্য সহকারী (ইন্দ্রিয়, আলোক প্রভৃতিকেও) গুলিকেও প্রমাণ বলতে হয়। প্রমেয় হিসাবে ঘটকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই। ঘট যে প্রমেয় হতে পারে না সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে নাগার্জুনের যুক্তি খুবই স্পষ্ট। যেহেতু ঘট, ঘটজ্ঞানের উৎপত্তিতে সহায়তাকারী শর্তগুলির মধ্যে একটি শর্ত মাত্র, তাই তাকে পৃথক ভাবে প্রমেয়ের মর্যদা দেওয়া যাবে না। কাজেই ঘটের ধারণাকে যদি প্রমাণ বলে গন্য করা হয়ও তথাপি ঘট তার প্রমেয় হতে পারে না।

ধারণা (ঘটের) যে প্রমাণ হতে পারে না তা দেখাতে গিয়ে অন্য একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন নাগার্জুন। যুক্তিটি এই- পূর্বপক্ষীরা ধারণাকে ইতঃপূর্বে প্রমেয়ের মর্যদা দিয়েছেন আর তাই পরে সেই ধারণাকে প্রমাণ বলে দাবি করতে পারেন না তাঁরা। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, গৌতম ন্যায় দর্শনের নবম সূত্রে দ্বাদশ প্রমেয়ের উল্লেখ করেছে।[17] ঐ দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ যেমন রয়েছে তেমনি বুদ্ধিও রয়েছে। এখানে ‘বুদ্ধি’ শব্দটিকে ধারণা অর্থে গ্রহণ করেছেন নাগার্জুন।

[17] আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত,ভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্ত্ত প্রমেয়ম।, ন্যায়সূত্র ১/৯ ।

আর ‘বুদ্ধি’কে ধারণা হিসাবে গ্রহণ করে তিনি দাবি করেছেন যেহেতু প্রমেয় তালিকার মধ্যে বুদ্ধি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাই তাকে আর প্রমাণ বলে গণ্য করা যায় না। যা প্রমেয় তা প্রমাণ হতে পারে না। একই বস্তুতে যুগপদ প্রমেয়ত্ব ও প্রমাণত্ব সিদ্ধ নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রমাণবাদীর আপত্তি খণ্ডনে নাগার্জুন

প্রমাণ ও প্রমেয়ের ধারণার অসারতা প্রতিষ্ঠায় নাগার্জুন উত্থাপিত যুক্তিগুলির পরিচয় আমারা পেয়েছি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। ঐসব যুক্তি গ্রহণ করলে প্রমাণ ও প্রমেয়ের উচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু প্রমাণ বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে মাধ্যমিকের সর্বশূন্যবাদ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? প্রমেয় ও প্রমাণ যদি শূন্য হয় তাহলে 'সর্বং শূন্যম্' – এই সিদ্ধান্ত অনুপপন্ন হয়। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করে নাগার্জুন তাঁর 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' গ্রন্থের ৩১-৫১ নং কারিকাতে প্রমাণবাদীদের সম্ভাব্য সেই আপত্তির উত্তর দিয়ে প্রমাণ, প্রমেয়ের বিভাজনটি যে অর্থহীন তা প্রমাণ করেছেন।

অপ্রমাণবাদি নাগার্জুনের বিরুদ্ধে প্রমাণবাদীরা যেসব আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন তাদের মধ্যে একটি এই যে যদি ভাব বস্তুর স্বভাব বলে কিছু না থাকে তাহলে 'সকল ভাব বস্তু হয় নিঃস্বভাব' এই বচনটিও স্বভাবশূন্য হয়। সুতরাং এর সাহায্যে অন্যের স্বভাব অস্বীকার করা যায় না।[1] প্রসঙ্গত বলা দরকার যে স্বভাবশূন্যতা বলতে বৌদ্ধরা হেতু, প্রত্যয়, হেতুপ্রত্যয় সামগ্রী প্রভৃতির নির্ভরতাকে বোঝেন। যা কিছু হেতু, প্রত্যয় বা হেতুপ্রত্যয় সামগ্রী নির্ভর তা স্বভাবশূন্য। আর ঠিক এই যুক্তিতে সব বস্তুকে স্বভাবশূন্য বলে মাধ্যমিক সম্প্রদায়। যেমন- একটি অঙ্কুর হল স্বভাবশূন্য, কারণ তা

---

[1] সর্বেষাং ভাবানাং সর্বত্র ন বিদ্যতে স্বসভাবশ্চৎ। ত্বদ্বচনমস্বভাবং ন নিবর্তয়িতুং স্বভাবমলম্,Nāgārjuna, Vigrahavyāvartanī Trans by Bhattacharya Kamaleswar, edited by E.H Johnston and Arnold Kunst. Motilal Banarsidass, Delhi, পৃ-১০।

যেমন বীজের মধ্যে সৎ নয় তেমনি তা প্রত্যয় মাটি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ বা হেতুপ্রত্যয় সামগ্রীর মধ্যেও সৎ নয়। ফলে অঙ্কুরের স্বভাব কোথাও নিহিত থাকতে পারে না। কাজেই তাকে স্বভাবশূন্য বলতে হয়। আর যা স্বভাবশূন্য তা শূন্যই। যেভাবে একটি অঙ্কুরের স্বভাব কোথাও না থাকায় তা শূন্য সেভাবে প্রতিটি ভাব পদার্থও শূন্য।

ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে যে বিবৃতির দ্বারা মাধ্যমিক বৌদ্ধরা ভাবের শূন্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চান তাও শূন্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন হল কেন? কারণ তার বাক্যটি এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে চার মহাভূতের মধ্যে নিহিত নেই। তা যেমন বক্ষে, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, জিহ্বাতে, দন্তমূলে নিহিত নেই তেমনি নাসিকা, মস্তিষ্ক ইত্যাদিতেও নিহিত নেই। এই সব হেতুপ্রত্যয়ের সমাহারের মধ্যেও তা নিহিত নেই। অতএব কোথাও এর অস্তিত্ব নেই বা এর নিজস্বভাব বলে কিছু নেই। আর যেহেতু এটি কোথাও নেই তাই এর স্ব-ভাব বলে কিছু নেই, এটি শূন্যই। এরকম একটি বচনের সাহায্যে সবকিছুর সত্তা বা স্বভাব অস্বীকৃত হতে পারে না বা এটি সেই অস্বীকারের পক্ষে উপযোগী নয়। যে আগুনের অস্তিত্ব নেই তার দ্বারা দহন হয় না। যে অস্ত্র সৎ নয় তা ছেদন করতে পারে না। যে জল অসৎ তা বাষ্পীভূত হতে পারে না। একই যুক্তিতে যে বচন সৎ নয় তার দ্বারা সকল বস্তুর স্বভাবের নিষেধ হতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্তীর পক্ষ অস্বীকৃত বা অবৈধ।

এখানে মাধ্যমিক বৌদ্ধ এমন কথা বলতে পারেন যে তার বাক্যটির নিজ স্বভাব রয়েছে বা তা সস্বভাব তাই তার দ্বারা অন্য সব বস্তুর স্বভাবের প্রতিষেধ অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এরকম আত্মপক্ষ সমর্থনকে পূর্বপক্ষী আত্মবিরোধী বলে দাবী করবেন কারণ

যদি মাধ্যমিক তার নিজ বাক্যের স্বভাব স্বীকার করেন তাহলে তার পক্ষ ধ্বংস হয়। আর যদি তিনি বলেন যে তার বাক্যটি অন্য সব কিছু থেকে আলাদা বা অসাধারণ, তাহলে সেই অসাধারণত্ব কি – কী কারনে তার বচনটি ব্যতিক্রমী – তার ব্যাখা তাকে দিতে হবে। এই সমস্যা সমাধানে মাধ্যমিক এমন কথা বলতে পারেন যে তার বচনটি স্বকীয় স্বভাবযুক্ত, আর তাই তা অশূন্য। আর সেই কারণে ঐ বচনের দ্বারা অন্য সব কিছুর স্বভাব অস্বীকৃত হতেই পারে। যদি তিনি তাই বলেন তাহলে পূর্বপক্ষীর আপত্তি হবে 'সকল ভাববস্তু হয় শূন্য' বাদীর এই নিজ পক্ষ ধ্বংস হবে। আরও কথা শূন্যবাদীর বাক্যটি সকল ভাব বস্তুর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। যদি সব কিছুই শূন্য হয় তাহলে তাঁর বাক্যটি অশূন্য হয় কীভাবে? এই বাক্যের দ্বারা সবকিছুর স্বভাব অস্বীকৃত হয়, কারণ তাঁর স্বভাব আছে এমন কথা বলা স্ববিরোধী। এই স্ববিরোধীতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাধ্যমিকের বিরুদ্ধে ষঠকোটিকবাদ (Satkotikovadah) প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারেন পূর্বপক্ষী।[2] তিনি আপত্তি করতে পারেন -

i. যদি সব বস্তুই শূন্য হয় তাহলে তোমার বাক্যও শূন্য, সব বস্তুর মধ্যে যেহেতু তা অন্তর্ভুক্ত। যার দ্বারা প্রতিষেধ হয় তা শূন্য হলে প্রতিষেধ যৌক্তিকভাবে অশূন্য নয় (এ যেন আমার মাতা বন্ধ্যা এই উক্তির মতো)। এই পরিস্থিতিতে সকল বস্তুর প্রতিষেধ হয় যে বাক্যের দ্বারা তা বৈধ নয়।

2 এবং ষট্ কোটিকোবাদঃ প্রসক্তঃ স পুনঃ কথমিতি, তদেব, p-6-7.

ii. পক্ষান্তরে যদি তোমার বাক্য ‘সকল ভাববস্তু হয় শূন্য’ বৈধ হয় তাহলে তোমার বাক্য অশূন্যই। কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার প্রতিষেধ অবৈধ।

iii. এখন সব বস্তুই যদি শূন্য হয় এবং তোমার বচনটি যদি অশূন্য হয় তাহলে বলতে হয় তোমার বচনটি সব বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই তোমার বচনটি যে স্ববিরোধী তা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এখানে দৃষ্টান্ত বিরোধ হয়।

iv. পক্ষান্তরে তোমার বচনটি যদি সব বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, আর যদি সব বস্তুই শূন্য হয় তাহলে তোমার বচনটিও শূন্য। আর এটি যদি স্বরূপত শূন্য হয় তাহলে এর দ্বারা প্রতিষেধ হতে পারে না।

v. এখন যদি এটি শূন্য হয় তাহলে এর দ্বারা যে প্রতিষেধ তাও হবে শূন্য। কিন্তু তোমার মত হল ‘সকল বস্তু হয় শূন্য’ এই বাক্যটি কার্য করতে সক্ষম বা এর কারিত্বআছে। স্পষ্টতই এরকম দাবি উদ্ভট (কারণ যার দ্বারা প্রতিষেধ শূন্য তাঁর কারিত্ব থাকে কিভাবে?)। কাজেই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব বস্তুই শূন্য এবং কার্য সম্পাদনে তারা অক্ষম। এখন তোমার বচনটি যদি স্ববিরোধী না হয় তাহলে তোমার শূন্য বচনের দ্বারা সব বস্তুর স্বভাবের প্রতিষেধ হবে কিভাবে ? ঐ প্রতিষেধকে কখনই বৈধ বলা যাবে না।

vi. আরও কথা যদি তোমার বচন সৎ হয় তাহলে তা থেকে নিম্নলিখিত অসঙ্গতি দেখা দেবে; কিছু বস্তু হবে শূন্য আর অন্য কিছু বস্তু হবে অশূন্য (অথচ তুমি সব কিছুকে শূন্য বলেছো)। সেক্ষেত্রে কেন কিছু জিনিস

শূন্য আর কেন অন্যগুলি নয় তার বিশেষ কারণ তোমাকে দর্শাতে হবে। কিন্তু সেরকম কোন বিশেষ কারনের উল্লেখ করা এখানে তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ‘সকল বস্তু শূন্য’ তোমার এই বাক্যটি অবৈধ বা অযৌক্তিক হয়ে পরে।

এপর্যন্ত পূর্বপক্ষী যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছেন সেগুলি নাগার্জুনের কাছে ইষ্টাপত্তি। তিনি এ বিষয়ে পূর্বপক্ষীর সঙ্গে সহমত যে যদি হেতু, প্রত্যয়াদি অর্থাৎ হেতু, প্রত্যয়, আলম্বন, সমন্তর ও অধিপতি প্রভৃতি প্রত্যয় সমূহে সংযুক্তভাবে অথবা পৃথক পৃথক ভাবে না থাকে তাহলে তার বাক্য ‘সকল ভাব বস্তু হয় নিঃস্বভাব’ নিঃস্বভাব তথা শূন্যই হবে। কিন্তু তার জন্য সকল ভাবের শূন্যতা বিঘ্নিত হবে না, কেননা তার বচনটি যেমন শূন্য তেমনি ভাব সকলই শূন্য। কাজেই ভাব সকলের শূন্যতার সঙ্গে ‘সকল ভাব পদার্থ হয় নিঃস্বভাব’ বাক্যটি সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এখানে যদি পূর্বপক্ষী আপত্তি করেন যে নাগার্জুনের বাক্যটি স্বভাবশূন্য হওয়ায় তা সকল ভাবের শূন্যতা প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে তার প্রত্যুত্তরে নাগার্জুন এমন কথা বলবেন –‘আমাদের বাক্যের মতো তোমাদের বাক্যেও নিঃস্বভাব’[3] অর্থাৎ কিনা শূন্যতার কারণে ‘সকল ভাব হয় নিঃস্বভাব’ বাক্যটি যদি ভাবের স্বভাব শূন্যতা প্রতিষ্ঠায় ব্যার্থ হয় তাহলে একই যুক্তিতে ‘তোমার বাক্যটির শূন্যত্ব হেতু সকল ভাব পদার্থের শূন্যত্ব সিদ্ধ করতে একইভাবে ব্যর্থ হবে’।[4]

---

[3] ননু শূন্যত্বং সিদ্ধং ন্নিঃস্বভাবত্বাদস্য মদীয়বচসঃ , তদেব, পৃ-২৩।

[4] তত্র যদ্ভবতোক্তং ত্বদীয়বচসঃ শূন্যত্বাচ্ছূন্যতা সর্বভাবানাং নোপপদ্যত ইতি তন্ন , তদেব, পৃ-২৩।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে 'শূন্য' শব্দটি মাধ্যমিক দর্শনে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'শূন্য' কথার অর্থ সর্ব শূন্য নয়, স্বভাব শূন্য বা প্রতীত্যসমুৎপন্ন। মাধ্যমিক বৌদ্ধ যখন ধর্ম অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ সমূহের শূন্যতার কথা বলেন তখন ঐ পদার্থ সমূহের সাপেক্ষতা বা প্রতীত্যসমুৎপন্নতার কথাই বলেন। যেহেতু বৌদ্ধ মতে বস্তু মাত্রই হেতু, প্রত্যয় সাপেক্ষ ষেহেতু সাপেক্ষ বস্তুর নিজ স্বভাব থাকতে পারে না। সেকারণেই বস্তু মাত্রের শূন্যতা বা স্বভাবশূন্যতার কথা বলেন তারা। স্বভাব শূন্য হলেও বস্তু যেহেতু সর্ব শূন্য নয় তাই তার দ্বারা কার্যের উৎপত্তি ব্যাহত হয় না। প্রতীত্যসমুৎপন্ন তথা স্বভাব শূন্য হয়েও রথ কাষ্ঠ, তৃণ, মৃত্তিকাদি বহনে সক্ষম হয়। ঘট মধু, জল, দুগ্ধাদি ধারণক্ষম হয়। পট শীত, উষ্ণতাদি হতে রক্ষা করে।[5] তুল্য যুক্তিতে 'সকল ভাব পদার্থ হয় স্বভাব শূন্য' – এই বাক্যটি প্রতীত্যসমুৎপন্নতা হেতু শূন্য হওয়া সত্ত্বেও ভাব পদার্থ সমূহের স্বভাব প্রতিষেধে সক্ষম। কাজেই আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা ভাবের প্রতিষেধ অনুপপন্ন হয় না।

শূন্য হওয়া সত্ত্বেও 'সকল ভাব পদার্থ হয় শূন্য' – এই বচনটি যে সকল ভাবের স্বভাব নিষেধে সমর্থ্য হতে পারে সে কথা বোঝাতে গিয়ে নাগার্জুন কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ব্যক্তি ও জাদুকরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট যে ব্যক্তি তাকে 'নির্মিতক'[6] বলে অভিহিত করে নাগার্জুন বলেন, যেকোনো নির্মিতক ব্যক্তির উচিৎ অন্য নির্মিতক ব্যক্তিকে কোন বস্তু সৃষ্টি হতে বিরত করা। এখানে নিজে সৃষ্ট হয়েও অন্য সৃষ্ট

---

[5] যথা চ প্রতীত্যসমুৎপন্নত্বাৎ স্বভাবশূন্যা অপি রথপটঘটাদয়ঃ স্বেষু কার্যেষু কাষ্ঠতৃণমৃত্তিকাহরণমধুদকপয়সাং ধারণে শীতবাতাতপপরিত্রাণ প্রভৃতিষু বর্তন্তে , তদেব, পৃ-২৪।

[6] তদেব , পৃ-২৫।

বিষয়ের ক্রিয়া প্রতিষেধে তিনি সক্ষম। একইভাবে কোন জাদুকর (যিনি স্বরূপতঃ শূন্য) তার জাদু বিদ্যার দ্বারা সৃষ্ট ব্যক্তিকে তার কাজ থেকে বিরত করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রে যদি শূন্যের দ্বারা শূন্যর প্রতিষেধ সম্ভব হয়, তাহলে 'সকল ভাব বস্তু হয় শূন্য' বাক্যেটি স্বরূপতঃ শূন্য হয়েও অন্য সকল ভাবের শূন্যত্ব স্থাপনে অসফল হবে কেন?

পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে নাগার্জুনের প্রত্যুত্তর হল যেহেতু তিনি সবকিছুকে শূন্য বলে মানেন তাই নিজের বাক্যটি সস্বভাব এমন আত্মবিরোধী দাবি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর দিক থেকে কোন বাদ বা হানি হয়নি। আর যেহেতু সব কিছুকে শূন্য বলে নাগার্জুন আপন বাক্যকে সস্বভাব বলে দাবি করেন না, তাই তাঁর দিক থেকে 'বৈষম্যকত্ব বিষয়ক' দোষ হয় না। আর যেহেতু তাঁর দিক থেকে কোন বৈষম্য হয় না তাই সেই বৈষম্য বা ব্যতিক্রমের স্বপক্ষে কোন যুক্তি বা কারণ দর্শানোর দায় তার নেই। সুতরাং পূর্বপক্ষী যে ষটকোটিকবাদ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তা ব্যর্থ। কারণ সব কিছুকে শূন্য বলার সঙ্গে সঙ্গে নাগার্জুন যেহেতু আপন বাক্যের শূন্যতাও সমর্থন করেন তাই তাঁর পক্ষে কোন বাদ বা হানি না থাকায় ষটকোটিক বিষয়ক বিরোধ মুলক কথার প্রতিষেধ হয়।[7]

তাছাড়া, এখানে মাধ্যমিক বৌদ্ধ হয়তো বলতে পারেন যে 'সকল বস্তু নিঃস্বভাব' তাঁর এই বাক্যটি একটি অভিনব ও ব্যাতিক্রমী বাক্য যা অন্য বাক্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এটি নিজে সস্বভাব হয়েও অন্য সকলের স্বভাব শূন্যতা প্রতিষ্ঠায় সফল। এখানে

[7] তত্র যো ভবতা ষট্কোটিকো বাদ উক্তঃ সোৎপি তেনৈব প্রতিষিদ্ধঃ , তদেব, পৃ-২৫।

বলা দরকার যে যখন কেউ অন্যদের কথা থামানোর জন্য বলে 'শব্দ করো না' তার সেই বাক্য আসলে একটি শব্দ। কিন্তু শব্দ হওয়া সত্ত্বেও তা অন্য শব্দের প্রতিষেধ ঘটায়। একইভাবে 'সবকিছুই শূন্য' এই বাক্যটি নিজে শূন্য হওয়া সত্ত্বেও অন্য সবকিছুর স্বভাবের প্রতিষেধ করতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিকের এহেন আত্মপক্ষ সমর্থন হবে আত্মঘাতী। কারণ এখানে বক্তার মুখ নিঃসৃত শব্দ অন্য যেসব শব্দের প্রতিষেধ ঘটায় সেগুলি ভবিষ্যৎ শব্দ। অর্থাৎ 'শব্দ করো না' – এটি একটি অস্তিত্বশীল বাক্য যা ভবিষ্যৎ শব্দের অস্তিত্বকে প্রতিরুদ্ধ করে।[৪] কিন্তু 'সবকিছু শূন্য' স্বরূপতই শূন্য অর্থাৎ স্বভাবশূন্য। আর যাদের স্বভাব শূন্যতা ঐ বাক্যটি প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই ভাব সকলও অস্তিত্বহীন। সকল বস্তুর সত্ত্বা নিষেধকারী আলোচ্য বাক্যটি সাত্ত্বিক বাক্য নয়। কারণ সব বস্তুর স্বভাব যেমন অস্তিত্বহীন, তেমনি আলোচ্য বাক্যটিও অস্তিত্বহীন। ফলত 'শব্দ করো না' বাক্যর মতোই এই বাক্যটিও হবে ত্রুটিপূর্ণ। এখানে শূন্যবাদী হয়তো বলতে পারেন যে নিষেধের যখন নিষেধ হয় বা প্রতিষেধের যখন প্রতিষেধ হয় তখনও যা শূন্য তার দ্বারা অন্যের শূন্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং 'সকল ভাব হয় শূন্য' এই নিঃস্বভাব বাক্যের দ্বারা সকল ভাবের স্বভাবত্বের প্রতিষেধ অসম্ভব নয়। কারণ একে অসম্ভব বললে ' সকল ভাব শূন্য – একথা মিথ্যা' পূর্বপক্ষীর এই দাবী নিরর্থক হয়ে পরবে। কিন্তু এরকম আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা সার্থক হতে পারে না বলে পূর্বপক্ষী মনে করে। তাঁর যুক্তি - তোমার বাক্য তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বশতই ত্রুটিপূর্ণ; কিন্তু

[৪] মা শব্দবদিত্যেতৎ স্যাৎে বুদ্ধির্ন চৈতদুপপন্নম্। শব্দেন হ্যত্র সতা ভবিষ্যতো বারণং তস্য।, তদেব, পৃ-১২-১২।

আমার বাক্য তা নয়। এখানে শূন্যবাদী হয়তো বলবেন যে প্রতিষেধের প্রতিষেধ বলে কিছু হয় না। কিন্তু তা মানতে রাজী নন পূর্বপক্ষী। তাঁর দাবী যেহেতু মূল বাক্যটি তার নয় তাই তার দিক থেকে প্রতিষেধের কোন প্রতিষেধ সংগঠিত হয়নি।[9]

পূর্বপক্ষীর এরকম আপত্তির আশঙ্কা খণ্ডন করেছেন নাগার্জুন। তাঁর দাবী 'সকল ভাব শূন্য' মাধ্যমিকের এই সিদ্ধান্তটি মোটেই 'শব্দ করো না' বাক্যের সদৃশ নয়। কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি শব্দের দ্বারা শব্দান্তরের প্রতিষেধ হচ্ছে। যে ব্যক্তি বাক্যটি উচ্চারন করছেন তিনি যেমন নিজে শব্দ করছেন তেমনি যুগপদ একটি শব্দের প্রতিষেধও করছেন। কিন্তু একজন শূন্যবাদী যখন বলেন সকল ভাব বস্তু স্বভাব শূন্যতার কারণে শূন্য তখন তিনি ঠিক এরকম কথা বলে না। তিনি আসলে একটি নিঃস্বভাবের দ্বারা আর একটি নিঃস্বভাবের প্রতিষেধ করেন। আর 'নিঃস্বভাব পদার্থ সমূহ কোনও নিঃস্বভাব কিছুর দ্বারা প্রতিষেধ্য হলে "পদার্থ সমূহ স-স্বভাব" কথাটির নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়'।[10]

সহজ কথায় এখানে নাগার্জুন একথাই বলতে চান যে ব্যতিক্রমী বাক্যের দৃষ্টান্ত পূর্বপক্ষী উথাপন করেছেন তা আসলে কোন দৃষ্টান্তই নয়, তা একটি 'অদৃষ্টান্ত' কেননা ঐ বাক্যটির সঙ্গে প্রতিবাদীর বাক্যের কোন সাদৃশ্য নেই। কাজেই 'শব্দ করো না' বাক্যটি যেমন স্ববিরোধী এবং ত্রুটিপূর্ণ 'সব ভাব পদার্থ স্বভাব শূন্য' বাক্যটি তেমন নয়। এই বাক্যটি যেমন নিজে স্বভাব শূন্য তেমনি সবকিছুর স্বভাব শূন্যতা প্রতিষ্ঠায়ও

---

[9] প্রতিষেধপ্রতিষেধোৎপ্যেবমিতি মতং ভবেওদসদেব। এবং তব প্রতিজ্ঞা লক্ষণতো দূষ্যতে ন মম।, তদেব, পৃ-১৩।

[10] নৈঃস্বাভাব্যানাং চেন্নৈঃস্বাভাব্যেন বারণং যদি হি। নৈ স্বাভাব্যনিবৃত্তৌ স্বাভাব্যং হি প্রসিদ্ধং স্যাৎ।, তদেব, পৃ-২৭।

তা সক্ষম। কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট কোন নারীকে প্রকৃত নারী বলে ভুল করে কিছু লোক যখন তাকে কামনা করে তখন তথাগত বা তার কোন শিষ্য কৃত্রিম মানব সৃষ্টি করে তার সেই ধারণা দূর করতে পারেন। এখানে যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট মানবী তা যেমন শূন্য তেমনি তার 'অসদগ্রাহ' বা মিথ্যা জ্ঞানের প্রতিষেধ করে যে ব্যক্তি সেও শূন্য। একইভাবে 'সকল ভাব শূন্য' বাক্যটিও স্বরূপত নিঃস্বভাব হওয়া সত্ত্বেও অপর সকল ভাবের প্রতিষেধ করে থাকে।[11] আরও কথা 'শব্দ করো না' এই বাক্যটি (যেটিকে পূর্বপক্ষী সস্বভাব বলছেন সেটিও) নিজে নিঃস্বভাব। কারণ প্রতীত্যসমুৎপন্ন বস্তু মাত্রই নিঃস্বভাব। 'শব্দ করো না' বাক্যটি যেমন একদিকে কোন বক্তার দ্বারা উচ্চারিত তথা উৎপন্ন তেমনি ভবিষ্যৎ শব্দের প্রতিষেধক হওয়ার কারণে তার পরিসমাপ্তিও আছে। যা উৎপন্ন এবং বিনাশযোগ্য তা শূন্যই। সুতরাং 'সকল ভাব হয় শূন্য' এই বাক্যর সঙ্গে 'শব্দ করো না' বাক্যটিও নিঃস্বভাব। আর তাই পূর্বপক্ষীর হেতুটি 'সাধ্যসম' হয়।[12] পূর্বপক্ষীর উদ্দেশ্যে নাগার্জুনের বক্তব্য হল 'শব্দ করো না' বাক্যের মতো 'সকল ভাব হয় শূন্য' এই বাক্যকে ত্রুটিপূর্ণ বলে পূর্বপক্ষী অভিহিত করতে পারেন না। কারণ নাগার্জুনের প্রতিজ্ঞা বলে কিছু নেই। পূর্বপক্ষীর উদ্দেশ্যে নাগার্জুনের প্রশ্ন – বাক্য কী? প্রতিজ্ঞা কী? প্রতিজ্ঞার বৈশিষ্ট্যই বা কী? যেখানে সকল ভাব পদার্থই শূন্য, সেখানে প্রতিজ্ঞা বাক্যের কথা উত্থাপিত হতে পারে না। কাজেই যেভাবে পূর্বপক্ষী প্রতিজ্ঞা

---

[11] অথবা নির্মিতকায়াং যথা স্ত্রিয়াং স্ত্রীয়মিত্যসদ্গ্রাহম্। নির্মিতকঃ প্রতিহন্যাৎ কস্যচিদেবং ভবেদেতৎ।, তদেব, পৃ-২৭-২৮।

[12] অথবা সাধ্যসমোয়ং হেতুর্ন হি বিদ্যতে ধ্বনেঃ সত্তা। সংব্যবহারং চ বয়ং নানভ্যুপগম্য কথয়ামঃ।, তদেব, পৃ-২৮।

লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার কারনে নাগার্জুনের মতকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন তা যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। সহজ কথায় নাগার্জুনের যেহেতু নিজস্ব কোন প্রতিজ্ঞাই নেই তাই সেই প্রতিজ্ঞা দোষদুষ্ট বলে আপত্তি করা অসমীচিন।[13]

পূর্বপক্ষী নাগার্জুনের কাছে প্রশ্ন রাখেন যে ভাব পদার্থের প্রতিষেধ তিনি করছেন সেই ভাবকে তিনি জেনেছেন কীভাবে? তিনি যদি প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানার পর ভাবের প্রতিষেধ করে থাকেন তাহলে বলা যায় যে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে তিনি ঐ ভাব সমূহকে গ্রহণ করছেন সেই প্রত্যক্ষই অস্তিত্বশীল নয়। তিনি যেহেতু সব কিছুকে শূন্য বলে দাবী করছেন এবং যেহেতু প্রত্যক্ষ ও সবকিছুর অন্তভুর্ক্ত, তাই প্রত্যক্ষও শূন্য। যে প্রত্যক্ষ শূন্য তার সাহায্যে ভাবকে জানা সম্ভবই নয়। ফলে তার দ্বারা প্রতিষেধও সুদূর পরাহত। শুধু তাই নয় সব কিছু শূন্য হলে প্রত্যক্ষকর্তা এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ও শূন্য হয়। আর প্রত্যক্ষের বিষয় ও কর্তা না থাকলে প্রত্যক্ষের দ্বারা বিষয়ের গ্রহণ তথা প্রতিষেধ কোনোটি সম্ভব হয় না।[14] এমতাবস্থায় সর্বশূন্যতার যে দাবী নাগার্জুন রাখেন তা যথার্থ হতে পারে না। এমন কথাও বলা যায় না যে প্রত্যক্ষের দ্বারা না হলেও অনুমান, উপমান বা শব্দের দ্বারা ভাবের জ্ঞান লাভের পর তার প্রতিষেধ শূন্যবাদী করছেন।[15] কারণ প্রত্যক্ষ যেমন শূন্য অনুমানাদিও তেমনি শূন্য; প্রত্যক্ষের কর্তা এবং

---

[13] যদি কাচন প্রতিজ্ঞা স্যান্মে তত এষ মে ভবেদদোষঃ। নাস্তি চ মম প্রতিজ্ঞা তস্মান্নৈবাস্তি মে দোষঃ।, তদেব, পৃ-২৯।

[14] প্রত্যক্ষেণ হি তাবৎ যদ্যুপলভ্য বিনিবর্তয়সি ভবান্। তন্নাস্তি প্রত্যক্ষং ভাবা যেনোপলভ্যন্তে।, তদেব, পৃ-১৪।

[15] অনুমানং প্রত্যুক্তং প্রত্যক্ষেণাগমীপমানে চ। অনুমানাগমসাধ্যা যেৎর্থা দৃষ্টান্তসাধ্যাশ্চ।, তদেব, পৃ-১৪।

বিষয় যেমন শূন্য অনুমানাদির কর্তা এবং বিষয়ও তেমনি শূন্য। এমতাবস্থায় অনুমানাদির দ্বারা ভাবের জ্ঞান এবং তদপরে সেই ভাবের প্রতিষেধ ঘটেছে এমন ব্যখ্যাও যুক্তিযুক্ত নয়।

পূর্বপক্ষীর এই আত্মঅসংগতির দাবী মেনে নিতে রাজী নন নাগার্জুন। তিনি স্বীকার করেন যে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এদের কোন একটির বা সবগুলির দ্বারা যদি কোনও পদার্থের জ্ঞান হয় কেবল তাহলেই সেই পদার্থগুলির সম্বন্ধে কোনও কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা যায় (তাদের সিদ্ধ করা যায় বা প্রতিষেধ করা যায়)। কিন্তু তার দিক থেকে এতাবদ কোনও বস্তুর জ্ঞানই হয়নি। সুতরাং সেই বস্তু সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করতে তিনি রাজী নন। আর যে বস্তু সম্বন্ধে তিনি কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকারই করছেন না সেই বস্তুকে তিনি কোন্ প্রমাণের দ্বারা জেনেছেন – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান নাকি শব্দ কার দ্বারা – তার উত্তর দেওয়ার দায় নাগার্জুনের নেই। সুতরাং প্রত্যক্ষাদির শূন্যতার কারণে প্রতিষেধ্য বিষয়ের জ্ঞান অনুপপন্ন হওয়ায় প্রতিষেধ ও অনুপপন্ন হবে[16] – পূর্বপক্ষীর এই আপত্তি নিঃস্ফলা। তদুপরি পূর্বপক্ষীর কাছে নাগার্জুনের দাবী প্রমেয় সিদ্ধির উপায় হিসাবে যে প্রমাণের কথা পূর্বপক্ষী বলেন সেই প্রমাণ কীভাবে সিদ্ধ তার উত্তর তাকে দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'মানাধিনাং মেয়সিদ্ধি' হল নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত। এই মত মেনে নিলে প্রতিটি প্রমেয় পদার্থের সিদ্ধির জন্য প্রমাণ পদার্থ আবশ্যক হয়ে পরে। এই যুক্তিতে

[16] যদি কিঞ্চিদুপলভেয় প্রবর্তযেয়ং নিবর্তযেয়ং বা। প্রত্যক্ষাদিভিরর্থৈস্তদভাবান্মেৎনুপালম্ভঃ।, তদেব, পৃ-৩০।

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এই চতুর্বিধ প্রমান স্বীকার করেন নৈয়ায়িক। কিন্তু প্রমেয় পদার্থ যেমন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ তেমনি প্রমাণ পদার্থও অবশ্যই কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হবে। নাগার্জুনের প্রশ্ন প্রমাণ সাধক সেই প্রমাণ কী হবে?[17]– যদি নৈয়ায়িক বলেন যে প্রমাণের সিদ্ধিতে অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই তাহলে ‘সকল পদার্থ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ’ নৈয়ায়িকের এই সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িকের পক্ষে সিদ্ধান্ত ব্যাঘাত দোষ হয়।

যদি নৈয়ায়িক বলেন যে প্রমেয় সিদ্ধি যেমন প্রমাণাধিন তেমনি প্রমাণ সিদ্ধি প্রমাণান্তরের অধীন তাহলে তাদের অনবস্থার হাত থেকে নিস্তার নেই বলে নাগার্জুন মনে করেন। কেননা প্রমেয় সিদ্ধি যে প্রমাণের অধীন সেই প্রমাণের সিদ্ধি যেমন অন্য প্রমাণের অধীন হবে তেমনি প্রমাণের সাধক যে প্রমাণ তার প্রমাণও প্রমাণান্তর নির্ভর হবে। এমতাবস্থায় আদি প্রমাণ বলে কোনও কিছুই থাকবে না। আর আদি না থাকলে মধ্য, অন্ত বলেও কিছু থাকবে না। সুতরাং অনবস্থাক্রমকে স্বীকার করলে ‘প্রমাণ প্রমাণান্তর সিদ্ধ’ এই সিদ্ধান্তটি উপপন্ন হবে না।[18] এখানে পূর্বপক্ষী এমন কথা বলতে পারেন যে তাঁর প্রমাণের একটি বিশেষত্ব রয়েছে এবং তাঁর প্রমাণটি প্রমাণান্তর নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাধ দোষ থেকে তাঁর বক্তব্য মুক্ত হলেও বৈষম্য

[17]যদি চ প্রমাণতস্তে তেষাং প্রতিসিদ্ধিরর্থানাম্। তেষাং পুনঃ প্রসিদ্ধিং ব্রূহি কথং তে প্রমাণানাম্।, তদেব, পৃ-৩০-৩১।

[18] নাদেঃ সিদ্ধিস্তএাস্তি নৈব মধ্য স্য নান্ত্যস্য।, তদেব, পৃ-৩১।

দোষে দুষ্ট হবে বলে নাগার্জুন মনে করেন।[19] কেননা প্রমেয়ের সিদ্ধি প্রমাণের অধীন বলার পর প্রমাণের সিদ্ধি প্রমাণের অধীন নয় এমন কথা বলেছেন তিনি। প্রমেয়ের বেলায় সিদ্ধির যে নিয়ম তিনি স্বীকার করেছেন প্রমাণের বেলায় সেই নিয়মেরই লঙ্ঘন ঘটাচ্ছেন তিনি। এরকম বৈষম্যের কারণ কী তার ব্যাখ্যা তাঁকে দিতে হবে। তাছাড়া প্রমাণের দ্বারা সকল অর্থের প্রতিপত্তি মানেন তিনি। এমতাবস্থায় প্রমাণের সিদ্ধি প্রমাণ নিরপেক্ষ বললে সেই পূর্বসিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়। কিছু পদার্থের সিদ্ধি প্রমাণের অধীন, কিছু পদার্থের সিদ্ধি প্রমাণ নিরপেক্ষ– এমন দাবী যেমন অযৌক্তিক তেমনি বৈষম্যমূলক।

এমন আপত্তির উত্তরে পূর্বপক্ষী অন্য একটি বিকল্প উপস্থাপন করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন প্রমাণসমূহ যেমন নিজেদের সিদ্ধ করে তেমনি অন্য পদার্থকেও সিদ্ধ করে। অর্থাৎ কিনা প্রমেয় পদার্থ সমূহের সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণগুলি যুগপৎ আপন আপন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এরকম বললে তা হবে ‘বিষমোপন্যাস’ এর দৃষ্টান্ত। আলোক যেমন নিজেকে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর বস্তুকে প্রকাশ করে প্রমাণও সেইরূপ নিজেকে সিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর প্রমেয়কে সিদ্ধ করে। কিন্তু পূর্বপক্ষীর এই যুক্তির সঙ্গে নাগার্জুন সহমত নন। তাঁর মতে এটি ‘বিষমোপন্যাস’ এর

[19] তেষামথ প্রমাণৈর্বিনা প্রসিদ্ধির্বিহীয়তে বাদঃ। বৈষমিকত্বং তস্মিন্ বিশেষহেতুশ্চ বক্তব্যঃ।, তদেব, পৃ-৩২।

দৃষ্টান্ত।[20] কারণ অগ্নি নিজেকে প্রকাশ করে একথা বলা যায় না। কেননা আলোক যে বিষয়কে প্রকাশ করে তা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে অন্ধকারের গর্ভে উপস্থিত থাকে। যেমন – একটি ঘট আলোক দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার আগে অপ্রকাশিত অবস্থায় অন্ধকারে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে তা আলোক দ্বারা প্রকাশিত হয়। যদি আলোক (নিজের দ্বারা) প্রকাশিত হয় বলা হয় তাহলে ঘটের মতো তাও প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে অপ্রকাশিত অবস্থায় অন্ধকারে থাকে – একথা মেনে নিতে হয়। অথচ আলোক অন্ধকারের মধ্যে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে একথা মেনে নেওয়া যায় না। সুতরাং আলোক নিজেকে প্রকাশ করে এই দাবী সঙ্গত নয়।

আরও কথা, যদি মেনে নেওয়া হয় যে বহ্নিরূপ আলোক অন্য বস্তুকে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করে তাহলে অন্য বস্তুকে দহন করে বলে তা নিজেকেও দহন করুক – এই আপত্তি হবে। বহ্নিরূপ আলোক যে নিজেকে দহন করে না তা সর্বানুভব সিদ্ধ। সুতরাং বহ্নিরূপ আলোক নিজেকে প্রকাশ করে – এমন সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। আর যদি বহ্নিরূপ আলোক নিজেকে প্রকাশ করে একথা না বলা যায় তাহলে বহ্নিরূপ আলোকের ন্যায় প্রমাণও (প্রমেয়কে সিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে) নিজেকে প্রকাশ করে – এমন দাবী করা যায় না।[21]

---

[20] বিষমোপন্যাসোৎয়ং ন হ্যাত্মানং প্রকাশয়ত্যগ্নিঃ। ন হি তস্যানুপলব্ধিদৃষ্টা তমসীব কুম্ভস্য।, তদেব, পৃ-৩২।

[21] যদি চ স্বাত্মনময়ং ত্বদ্বচনেন প্রকাশয়ত্যগ্নিঃ। পরমিব নন্বাত্মনং পরিধক্ষ্যত্যপি হুতাশঃ।, তদেব, পৃ-৩৩।

আলোক যে স্বপ্রকাশক হতে পারে না সে কথা প্রমাণ দিতে গিয়ে নাগার্জুন আর একটি তর্কের অবতারণা করেন। তর্কটি প্রতিষ্ঠিত আলোক ও অন্ধকারের বৈপরীত্যের উপর। এই তর্কে দাবী করা হয় আলোক যদি পরপ্রকাশক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্রকাশক হয় তাহলে তার সঙ্গে বৈপরীত্য রয়েছে যে অন্ধকারের তা পরআবরক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বআবরক হবে।[22] কিন্তু এই কল্পনা বাস্তব নয় (কেননা অন্ধকার নিজেকে আবৃত করে এমন অনুভব হয় না)। এমতাবস্থায় আলোক একাধারে পরপ্রকাশক এবং স্বপ্রকাশক এমন দাবী সিদ্ধ নয়।

তাছাড়া আলোক স্বপ্রকাশক বা সর্বপ্রকাশক একথা বলার অর্থ কী?– প্রকাশ মাত্রই অন্ধকারের বিনাশকে সূচিত করে। কোন কিছুকে প্রকাশ করার অর্থ অন্ধকারকে দূর করে তাকে ভাস্বর করে তোলা। কিন্তু যেখানে আলোক থাকে সেখানে অন্ধকার থাকে না। আলোকের মধ্যে যেমন কোন অন্ধকার নিহিত থাকে না, তেমনি যে স্থানে আলোক থাকে সেই স্থানেও অন্ধকার থাকে না। কাজেই সেই অন্ধকার (আসলে) কোন্ অন্ধকার যাকে বিনষ্ট করে আলোক নিজেকে প্রকাশ করবে? সহজ কথায় আলোকের মধ্যে বা আলোকের স্থানে যেহেতু অন্ধকার থাকে না সেহেতু প্রকাশ মানেই অন্ধকারের

---

[22] যদি চ স্বপরত্মানৌ ত্বদ্বচনেন প্রকাশয়ত্যগ্নি। প্রচ্ছাদয়িষ্যতি তমঃ স্বপরাত্মানৌ হুতাশ ইব।, তদেব, পৃ-৩৩।

বিনাশ করে প্রকাশ তাই আলোক নিজেকে প্রকাশ করে এমন কথার কোন অর্থ হয় না।[23]

এখানে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে আলোকে অন্ধকার না থাকায় একথা প্রমাণ করে যে আলোক অন্যকে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করে। যেহেতু আলোক পরপ্রকাশক এবং স্বপ্রকাশক তাই উৎপদ্যমান আলোকে যেমন অন্ধকার থাকে না তেমনি আলোকিত স্থানেও অন্ধকার থাকে না। আলোক এবং আলোকিত স্থানে অন্ধকারের অনুপস্থিতিই প্রমাণ করে যে তা যুগপদ স্বপ্রকাশক এবং পরপ্রকাশক।

কিন্তু উৎপদ্যমান আলোকে স্বপ্রকাশত্ব ও পরপ্রকাশত্বের দাবীকে ‘অসৎবাদ’ বলে নস্যাৎ করেন নাগার্জুন। পূর্বপক্ষীর দাবী যে যথাযথ নয় তা বোঝাতে নাগার্জুন যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁর যুক্তি হল আলোক যদি উৎপদ্যমান অবস্থায় নিজেকে ও অন্যকে প্রকাশ করে তাহলে উৎপত্তিকালীন অবস্থায় তা অন্ধকারের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। কিন্তু উৎপত্তিকালীন অবস্থায় অন্ধকারের সঙ্গে আলোক সংযুক্ত হতে পারে না। তাই অন্ধকার নাশ করে তা অন্যকে বা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না।[24] আর যদি অন্ধকারের সঙ্গে সংযোগ ছাড়াই আলোক অন্ধকার নাশ করে বলে পূর্বপক্ষী দাবী করেন তাহলে এক দেশস্থিত অগ্নি বহু দূরবর্তী অন্য দেশস্থিত অন্ধকারকে নাশ করতে সক্ষম হবে। সেক্ষেত্রে এক আলোক দ্বারাই যাবৎ অন্ধকারের বিনাশ হবে। কিন্তু এমন ঘটনা

---

[23] নাস্তি তমশ্চ জ্বলনে যএ চ তিষ্ঠতি পরাত্মনি জ্বলনঃ। কুরুতে কথং প্রকাশং স হি প্রকাশোৎন্ধকারবধঃ।, তদেব, পৃ-৩৪।

[24] উৎপদ্যমান এব প্রকাশয়ত্যগ্নিরিত্যসদ্বাদঃ। উৎপদ্যমান এব প্রাপ্নোতি তমো ন হি হুতাশঃ।, তদেব, পৃ-৩৪-৩৫।

কদাপি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং অন্ধকারের সঙ্গে অসংযুক্ত অবস্থায় অগ্নি তার নাশক হতে পারে পূর্বপক্ষীর এই সম্ভাব্য দাবীটি ভিত্তিহীন।

শুধু তাই নয় পূর্বপক্ষী প্রমাণ গুলিকে আলোকের সঙ্গে তুলনা করে স্বতঃসিদ্ধ বলেছেন। কিন্তু সত্যি কি তাদের স্বতঃসিদ্ধ বলা যায়? যা স্বতঃসিদ্ধ হয় তা অন্য নিরপেক্ষ ভাবে সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রমাণ গুলি কি তাই? প্রমাণগুলি কি তাদের সিদ্ধির জন্য প্রমেয় সমূহের উপর নির্ভর নয়?[25] এখানে পূর্বপক্ষী হয়তো বলবেন প্রমাণগুলির সিদ্ধি প্রমেয় নিরপেক্ষ বলে মানলে ক্ষতি কী? নাগার্জুনের উত্তর হল সেক্ষেত্রে তাদের আর প্রমাণ বলা যাবে না। কারণ কোন পদার্থের সিদ্ধির হেতু হিসাবেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বলে গণ্য হয়। ঐসব প্রমেয় নিরপেক্ষ ভাবে তাদের প্রমাণত্ব সিদ্ধি হয় না বা তাদের প্রমাণ বলা যায় না।

এই অসুবিধার সন্মুখীন হয়ে পূর্বপক্ষী হয়তো প্রমেয় সাপেক্ষ ভাবে প্রমাণগুলি সিদ্ধ বলে মানবেন। কিন্তু সেরকম কথা বললে প্রমাণগুলিকে আর স্বয়ংসিদ্ধ বলা যাবে না। আর প্রত্যক্ষ্যাদি প্রমাণগুলি স্বয়ংসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যদি তারা সিদ্ধির জন্য প্রমেয় নির্ভর হয় তাহলে সিদ্ধের সাধন স্বীকার করতে হবে।[26] অথচ সিদ্ধসাধন একটি দোষ হিসাবে গন্য হয়। এই সমস্যারই আর একটি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নাগার্জুন। যদি প্রমাণগুলি সর্বদাই প্রমেয় সাপেক্ষভাবে সিদ্ধ হয় তাহলে

---

[25] যদি স্বতশ্চ প্রমাণসিদ্ধিরনপেক্ষ তব প্রমেয়াণি। ভবতি প্রমাণসিদ্ধির্ন পরাপেক্ষা স্বতঃ সিদ্ধিঃ।, তদেব, পৃ-৩৫।

[26] . অথ মতমপেক্ষ্য সিদ্ধিস্তেষামিত্যএ ভবতি কো দোষঃ। সিদ্ধস্য সাধনং স্যান্নসিদ্ধোৎপেক্ষতে হ্যন্যৎ।, তদেব, পৃ-৩৬।

প্রমেয়গুলিকে আর প্রমাণ সাপেক্ষ বলা যাবে না।[27] 'ক' এর সিদ্ধি যদি 'খ' এর উপর নির্ভর হয় তাহলে 'খ' এর সিদ্ধি 'ক' এর উপর নির্ভর – এ কথা বলা যায় না (তেমন কথা বললে অন্যোন্যাশ্রয় বা চক্রক দোষ হয়)। কাজেই প্রমাণগুলি যদি প্রমেয় সাপেক্ষে প্রমাণ বলে গন্য হয় তাহলে 'মানাধিনাং মেয় সিদ্ধি' এই মত অগ্রাহ্য হবে। আর যদি প্রমেয় সিদ্ধি প্রমাণের নির্ভর না হয় তাহলে প্রমাণগুলি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে?[28] – যেগুলি সাধনের জন্য প্রমাণের অবতারণা সেগুলি যদি সিদ্ধই হয় তাহলে প্রমাণ স্বীকার নিরর্থক হয়। এমতাবস্থায় প্রমেয় সমূহকে সিদ্ধির জন্যই প্রমাণের প্রয়োজন – এরকম যুক্তি আর জোরালো বলে মনে হয় না।

প্রমেয় সম্বদ্ধভাবে প্রমাণগুলি সিদ্ধ হয় বলার আরও একটি অসুবিধা আছে। যদি প্রমেয় নির্ভর হয়েই তথাকথিত প্রমাণগুলির সিদ্ধি সম্ভব হয় তাহলে প্রমেয়গুলি প্রমাণবৎ হয়। যার সাহায্যে প্রমাণিত হয় তাই যদি প্রমাণ হয় তাহলে প্রমেয় বস্তুর সাহায্যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হিসাবে সিদ্ধ হওয়ায় প্রমেয় বস্তুগুলি তাদের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হয়। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে পরে প্রমেয় আর প্রমেয় হয়ে পরে প্রমাণ। এরকম অস্বস্তিকর অবস্থান থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে পূর্বপক্ষী হয়তো মানবেন যে প্রমেয়ের সিদ্ধি যেমন প্রমাণ নির্ভর তেমনি প্রমাণের সিদ্ধি প্রমেয় নির্ভর। কিন্তু এরকম হলে প্রমাণ,

---

[27] সিধ্যন্তি হি প্রমেয়াপেক্ষ্য যদি সর্বথা প্রমাণানি। ভবতি প্রমেয়সিদ্ধির্নাপেক্ষ্যৈব প্রমাণানি।, তদেব, পৃ-৩৭।

[28] যদি চ প্রমেয়সিদ্ধির্নাপেক্ষ্যৈব ভবতি প্রমাণানি। কিং তে প্রমাণাসিদ্ধয়া তানি যদর্থং প্রসিদ্ধং তৎ।, তদেব, পৃ-৩৭।

প্রমেয় দুটি অসিদ্ধ হয়ে পরবে বলে মনে করেন নাগার্জুন। ‘ক’ এর সিদ্ধি যদি ‘খ’ নির্ভর হয় – সেই খ যার সিদ্ধি ক এর অপেক্ষা রাখে – তাহলে ক এর সিদ্ধি যেমন অসম্ভব হয় তেমনি খ এর সিদ্ধিও হয় সুদূরপরাহত। প্রমেয় নির্ভর না হয়ে যদি প্রমাণের সিদ্ধি না হয় এবং প্রমেয় যদি প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ না হয় তাহলে প্রমাণ অসিদ্ধ হয়। একইভাবে প্রমাণ নির্ভর না হয়ে যদি প্রমেয়ের সিদ্ধি অসম্ভব হয়, এবং সেই প্রমাণ আবার যদি প্রমেয় নির্ভর হয়, তাহলে প্রমেয়ের সিদ্ধি অনুপপন্ন হয়। এইভাবে একাধারে প্রমাণ ও প্রমেয় উভয়ের সিদ্ধি ব্যাহত হয়।

সমস্যাটির গভীরতা ব্যাখা করতে গিয়ে নাগার্জুন পিতা-পুত্রের উপমা ব্যাবহার করেছেন। পূর্বপক্ষীর কাছে তাঁর প্রশ্ন পুত্র যেমন পিতার দ্বারা উৎপাদনীয় সেইরূপ যদি পিতাও পুত্রের দ্বারা উৎপাদনীয় হয়, (অর্থাৎ পুত্র সাপেক্ষে তাতে পিতৃত্ব সিদ্ধ হয়) তাহলে কে কার উৎপাদক তা পূর্বপক্ষীকে বলতে হবে। একই যুক্তিতে প্রমেয় যদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় এবং বিপরীতে প্রমাণ যদি প্রমেয় দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহলে প্রশ্ন কোনটি কাকে সিদ্ধ করে?[29] (প্রমান প্রমেয়কে নাকি প্রমেয় প্রমাণ কে?)। পিতা ও পুত্র উভয়ের মধ্যে অন্যতরের দ্বারা উৎপাদন যোগ্যতা রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের কে পিতা এবং কে পুত্র তার যেমন মীমাংসা হয়না তেমনি প্রমাণ ও প্রমেয় একে অন্যের

---

[29]পিতা যদুৎপাদ্যঃ পুত্রো যদি তেন চৈব পুত্রেণ। উৎপাদ্যঃ স যদি পিতা বদ তত্রোৎপাদয়তি কঃ কম্।, তদেব, পৃ-৩৯।

দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় প্রকৃত পক্ষে কোনটি প্রমাণ এবং কোনটি প্রমেয় সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়।[30]

লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এটি দুষ্ট উপমার ক্ষেত্র বলে মনে হবে। কেননা লৌকিক জ্ঞান অনুসারে পুত্রই পিতার দ্বারা উৎপাদন যোগ্য পিতা পুত্রের দ্বারা উৎপাদন যোগ্য নয়। বস্তুত এখানে নাগার্জুন ঐ লোকায়ত ধারণার বিরোধিতা করছেন না। তাঁর বক্তব্য এই নয় যে পিতা পুত্রের ঔরসজাত। আসলে তিনি একথাই বলতে চান কাউকে পুত্র বলে বুঝতে গেলে যেমন পিতার সাপেক্ষেই তাকে বুঝতে হয়, তেমনি কাউকে পিতা বলে অভিহিত করতে গেলেও কোন পুত্র বা সন্তানের সাপেক্ষে তাকে পিতা বলতে হয়। কাজেই একজন ব্যক্তির পুত্রত্ব যেমন তাঁর পিতার দ্বারা সিদ্ধ তেমনি একজন ব্যক্তির পিতৃত্বও তাঁর সন্তানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। বামের সঙ্গে দক্ষিণের যেমন একটি পরস্পর সাপেক্ষতা রয়েছে, ভালো এবং মন্দ যেমন একে অন্যের ছাড়া উপলব্ধ হয় না তেমনি পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব উভয়ে উভয়ের সাহায্য ছাড়া সিদ্ধ হয় না। এমতাবস্থায় এদের একটিকে সাধক এবং অন্যটিকে সাধ্য বলা যায় না। একই যুক্তিতে প্রমাণ ও প্রমেয়কে সাধক ও সাধ্য হিসাবে গন্য করা যায় না। প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার কারণে প্রমেয় যেমন সাধ্য তেমনি প্রমেয় নির্ভর হওয়ার কারণে প্রমাণও সাধ্য। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্রে সাধকত্ব ও সাধ্যত্ব প্রশক্ত হওয়ায় কোনটির ক্ষেত্রেই সাধকত্ব বা সাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। এমতাবস্থায় একটিকে প্রমাণ অন্যটিকে প্রমেয় বলা নিরর্থক হয়ে পরে।

[30] কশ্চ পিতা কঃ পুত্রস্তত্র ত্বং ব্রূহি তাবুভাবপিচ। পিতাপুত্রলক্ষণধরৌ যতো ভবতি নোৎত্রসন্দেহঃ।, তদেব, পৃ-৩৯।

সুতরাং নাগার্জুনের সিদ্ধান্ত "নৈব স্বতঃ প্রসিদ্ধির্ন পরস্পরতঃ পরপ্রমানৈর্বা। ন ভবতি ন চ প্রমেয়ৈন চাপ্যকস্মাৎ প্রমানাম্" অর্থাৎ প্রমাণ সমূহ না স্বতঃ বা স্বনির্ভর, না পরস্পরতঃ অর্থাৎ এক অন্য নির্ভর, না পরপ্রমানতঃ অর্থাৎ পরতঃ, না প্রমেয় দ্বারা সিদ্ধ, না অকস্মাৎ। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বৃত্তিতে। সেখানে পাঁচটি বিকল্প নিরাসের দ্বারা প্রমাণের সিদ্ধি যে সম্ভব নয় তা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। প্রথমতঃ প্রমাণগুলি স্বতঃসিদ্ধ হতে পারে না। কারণ কোনও প্রত্যক্ষের সিদ্ধি যেমন সেই প্রত্যক্ষের দ্বারা হয় না তেমনি কোনও অনুমান, উপমান বা শব্দের সিদ্ধি সেই অনুমান, উপমান বা শব্দ দ্বারা হয় না। দ্বিতীয়তঃ প্রমাণগুলি পরস্পরের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। এমন বলা যায় না যে প্রত্যক্ষ, উপমান এবং আগম দ্বারা উপমান, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম দ্বারা এবং আগম, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট; এরকম দাবী করলে অন্যোন্যাশ্রয় প্রসঙ্গ হয়। তৃতীয়তঃ প্রমাণগুলি যেমন স্বতঃপ্রমাণিত হতে পারে না তেমনি পরতঃ প্রমাণিতও হতে পারে না। এমনটা বলা যায় না এক প্রত্যক্ষ অন্য প্রত্যক্ষ দ্বারা, এক অনুমান অন্য অনুমান দ্বারা, এক উপমান অন্য উপমান দ্বারা, এক আগম অন্য আগম দ্বারা সিদ্ধ। কারণ তেমন বললে যে প্রত্যক্ষান্তর, অনুমানান্তর, উপমানান্তর বা শব্দান্তর দ্বারা তারা সিদ্ধ হবে সেই সকল প্রমাণান্তর কিরূপে সিদ্ধ হবে সেই প্রশ্ন উঠবে এবং পরিনামে অনবস্থা দেখা দেবে। চতুর্থতঃ প্রমেয় ব্যষ্টিরূপে অথবা সমষ্টিরূপে প্রমাণের সিদ্ধি করতে পারে না। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে বৃত্তিকার বলেছেন 'নাপি প্রমেয়ৈঃ সমস্তব্যস্তৈঃ স্ববিষয় পরবিষয়সংগ্রহীতৈঃ'।[31] অর্থাৎ কিনা স্ব বিষয়ে এবং পর বিষয়ে সংগৃহীত বলে প্রমেয় সমূহ এককভাবে বা

[31] তদেব, পৃ-৪০।

সমষ্টিগত ভাবে প্রমাণসমূহকে সিদ্ধ করতে পারে না। পঞ্চমতঃ প্রমাণ অকস্মাৎ ভাবে বা অহেতুক ভাবে সিদ্ধ এমন দাবীও করা যায় না। অবশেষে উল্লিখিত সকল কারণের সমুচ্চয়ে– তার সংখ্যা কুড়ি, ত্রিরিশ, চল্লিশ কিংবা ছাব্বিশ যাইহোক– ঐ প্রমাণগুলি সিদ্ধ এমন কথাও বলা যায়না। এমতাবস্থায় যেহেতু প্রমেয়সমূহ প্রমাণ রাজীর দ্বারা গৃহীত হয় তাই প্রমেয় সকলের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণগুলিও সিদ্ধ– পূর্বপক্ষীর এই পক্ষ অযৌক্তিক বলে গণ্য হয়। এককথায় প্রমেয় সকল প্রমাণগম্য বলেই প্রমেয় সিদ্ধির দ্বারা যুগপদ প্রমাণ সকলের সিদ্ধি হয়– পূর্বপক্ষীর এইরূপ আত্মপক্ষ সমর্থন আর যুক্তিসহ বলে মনে হয় না।

লৌকিক ব্যবহারের সূত্র ধরে পূর্বপক্ষী বলতে পারো যে ভালো জিনিসের একটা ভালো স্বভাব বা ভালোত্ব থাকবে। আর এই যুক্তিটা (শুধু ভালো জিনিস কেন) সব কিছুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে।[32] ধর্মাবস্থাবিদ্গণ যেমন ভালো জিনিসের কুশলত্বের কথাও ভাবা যেতে পারে (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে নাগার্জুন ১১৯টি কুশলধর্ম এবং অন্য ধর্মের কথা বলেছেন)। (কাজেই বস্তু মাত্রেই যে শূন্য বা স্বভাবশূন্য তা বলা যায় কীভাবে?)। একইভাবে যেসব পদার্থ মুক্তির উপযোগী তারা যেমন নৈর্যাণিক স্বভাব তেমনি যেগুলি মুক্তির উপযোগী নয় সেগুলি অনৈর্যাণিক স্বভাব।[33] এমতাবস্থায় স্বভাব হীনতার কারণে সব বস্তুই শূন্য এমন দাবী করা যায় না। কারণ লোক ব্যবহারে বস্তুর

---

[32] কুশলানাং ধর্মাণাং ধর্মাবস্থাবিদশ্চমন্যতে। কুশলং জনাঃ স্বভাবং শেষেষ্বপ্যেষ বিনিয়োগঃ।, তদেব, পৃ-১৫।

[33] নৈর্যাণিকস্বভাবো ধর্মা নৈর্যাণিকাশ্চ যে তেষাম্। ধর্মাবস্থোক্তানামেবমনৈর্যাণিকাদীনাম্।, তদেব, পৃ-১৭।

স্বভাব স্বীকৃত। সুতরাং 'সকল ভাব পদার্থ শূন্য' নাগার্জুনের এই প্রতিজ্ঞা বাক্যটি অবৈধ।

উত্থাপিত এই আপত্তির উত্তর দিয়েছেন নাগার্জুন। তিনি মনে করেন ধর্মাবস্থাবিদগণ যদি সত্যসত্যই বস্তুর স্বভাব ধর্মের কথা বলে থাকেন তাহলে সেই কথার প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করা দরকার। তারা যদি এমন কথা বলে থাকেন যে কুশল ধর্মসমূহ স্বভাবতই কুশল তাহলে সবিস্তারে তার অর্থ বিশ্লেষণ করা দরকার। তাঁরা যদি এরকম উক্তি করেন 'এই সব কুশল স্বভাব', 'এই সব হল কুশল বস্তু' বা যদি তাঁরা বলেন যে 'এগুলি হল কুশল বিজ্ঞান' এবং 'এ হল কুশল বিজ্ঞানের স্বভাব' ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে তাঁরা স্বভাবকে স্বীকার করেন এমন কথা বলা যেত কিন্তু পূর্বপক্ষী সেরকম কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে অপারক। এমতাবস্থায় 'প্রতিটি পদার্থের স্বভাব যথাযথ ভাবে উপদৃষ্ট বা ব্যাখ্যাত হয়েছে' পূর্বপক্ষীর এরকম দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় না।[34]

কুশলত্ব, অকুশলত্ব ইত্যাদি স্বভাব ধর্মের স্বীকৃতি বৌদ্ধ নীতি দর্শনের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ কিছু ধর্ম যদি স্বভাবত কুশল বা অকুশল হয় তাহলে সেই ধর্মের স্বভাব পরিবর্তন সম্ভব হয় না। ফলে অনৈতিক থেকে নৈতিকে, মন্দ থেকে ভালোতে উত্তরনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। একই ভাবে যে ব্যক্তি ভালো বা কুশল বলে গণ্য তার সব কর্মই কুশল বলে বিবেচিত হয় – এরকম মানলে নৈতিক অগ্রগতিকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন নৈতিক অগ্রগতি অনুমোদন করে। তাছাড়া ধর্ম বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের মতও বিচারের ঊর্দ্ধে নয়। কোন একটি বিচারকে চূড়ান্ত,

---

[34] কুশলানাং ধর্মাণাং ধর্মমবস্থাবিদো ব্রুবন্তি যদি। কুশলং স্বভাবমেবং প্রবিভাগেনাভিধেয়ঃ স্যাৎ।, তদেব, পৃ-৪১।

অনপেক্ষ বা একান্তবাদী হিসাবে গন্য করা চলে না। বিশেষত মধ্যমোক দর্শন কোনও ঐকান্তিক নির্ণয়ের একান্ত বিরোধী। এখানে বস্তু সৎ বা অসৎ কোন একান্তবাদী সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়নি। এমতাবস্থায় কুশলত্ব বস্তুর স্বভাব এই নির্ণয় গ্রহনযোগ্য বলে মনে হয় না। কুশলত্ব, অকুশলত্ব ইত্যাদি যে বস্তুর স্বভাব ধর্ম হতে পারে না তা আর একভাবেও প্রমাণিত হয়। সকল বস্তুই প্রতীত্যসমুৎপন্ন অর্থাৎ হেতু, প্রত্যয় সামগ্রী থেকে উৎপন্ন। সুতরাং কুশল, অকুশল বস্তুগুলিও হেতু, প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন হবে। এমতাবস্থায় কুশলত্ব যেমন কুশল বস্তুর স্বভাব হতে পারে না তেমনি অকুশলত্ব অকুশল বস্তুর স্বভাব হতে পারে না।[35] এককথায় কোন বস্তুরই স্বভাব বলে কিছু থাকতে পারে না। কুশলত্ব বা শুভত্বকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলে স্বীকার করতে অসম্মত হতে পারেন পূর্বপক্ষী। তিনি বলতে পারেন যে কুশলত্ব হেতু, প্রত্যয়াদি জন্য নয় এবং সেকারণে তা বস্তুর স্বভাব ধর্ম। কিন্তু সেরকম বললে ব্রহ্মচর্যাদির অনুশীলন নিরর্থক হয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার অহিংসা, সত্য, অস্ত্রেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ ইত্যাদিকে প্রায় প্রতিটি দর্শন সম্প্রদায়ই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে স্বীকার করে। তাঁরা এও স্বীকার করেন যে ব্রহ্মচর্যাদি পালনের মাধ্যমে কুশলত্ব লাভ হয়। অর্থাৎ কিনা এগুলি কুশল ধর্মজনক ব্রত। কিন্তু কুশলত্ব যদি অনুৎপন্ন বা অপ্রতীতসমুৎপন্ন হয় তাহলে এইসব আচরণের উপদেশ ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয় কুশলত্বকে অনুৎপন্ন বললে প্রকারান্তরে

---

[35] যদি চ প্রতীত্য কুশলঃ স্বভাব উৎপদ্যতে স কুশলানাম্। ধর্মাণাং পরভাবঃ স্বভাব এবং কথং ভবতি।, তদেব, পৃ-৪১।

প্রতীত্যসমুৎপাদবাদকে অস্বীকার করা হয়।[36] অথচ স্বয়ং তথাগত এই প্রতীত্যসমুৎপাদবাদকে ধর্মের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'যাঁরা প্রতীত্যসমুৎপাদবাদকে দেখেন তাঁরা ধর্মকে দেখেন' এই ধর্মরূপ প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়মকে যিনি অমান্য করেন তারপক্ষে ব্রহ্মচর্যাদির অনুশীলন বা উৎযাপনের কোন অবকাশ থাকে না। কারন যিনি ধর্মেই অবিশ্বাসী তার ধর্মাচার কিভাবে সম্ভব?

যুক্তিটিকে আর একভাবে উপস্থাপন করা যায়। ধরাযাক, কুশলত্ব ইত্যাদি স্বভাব ধর্ম এবং অনুৎপন্ন তাহলে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিটি প্রত্যাখাত হয়। আর প্রতীত্যসমুৎপাদ যদি না থাকে তাহলে দুঃখের উৎপত্তি বলে কিছু থাকে না। দুঃখ বলে কিছু না থাকলে সেই দুঃখের নিরোধ একটি অলীক সম্ভবনা হয়ে পরে। যে দুঃখের নিরোধ নেই সেই দুঃখ নিরোধের উপায় হিসাবে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। সমভাবে নিষ্প্রয়োজন আর্যসত্য চতুষ্টয়ের জ্ঞান। পরিনতি স্বরূপ শ্রমন এবং শ্রামণ্য দুটিই অনুপপন্ন। যে সামান্য অনুপপন্ন তা লাভের লক্ষ্যে ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি ব্রতের আচরণ হয় সুদূরপরাহত।

নাগার্জুনের এই প্রতিযুক্তি সাধারণভাবে সেই পূর্বপক্ষীদের বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট যাঁরা ব্রহ্মচর্যাদির আচরণকে ধর্মাচরণ বলে মনে করেন। তবে তিনি যখন এই দাবী করেন যে প্রতীত্যসমুৎপাদবাদকে অস্বীকার করলে দুঃখ, দুঃখ নিরোধ, নিরোধের উপায়সহ সকল আর্যসত্যকে অস্বীকার করা হবে তখন সম্ভবত তিনি কেবলমাত্র শূন্যবাদী নয় সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য করেই তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। এখানে বলা দরকার

---

[36] অথ ন প্রতীত্য কিঞ্চিৎ স্বভাব উৎপদ্যতে স কুশলানাম্। ধর্মাণামেবং স্যাদ্বাসৌ ন ব্রহ্মচর্যস্য।, তদেব, পৃ-৪২।

যে সর্বাস্তিবাদী হীনযান সম্প্রদায় বস্তুর স্বভাব অস্বীকার করেন না। এঁদের উদ্দেশ্য নাগার্জুনের বক্তব্য হল–প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ নিয়ম অস্বীকার করলে যেমন একদিকে বুদ্ধ বচনকে অস্বীকার করা হয় তেমনি কী ধর্ম, কী অধর্ম, কী লৌকিক ব্যবহার সবই হয়ে পরে অর্থহীন।[37] এই তত্ত্ব অস্বীকৃত হলে যে সকল পদার্থ বস্তুত প্রতীতসমুৎপন্ন তাদের উৎপত্তি হবে কিভাবে? আর যদি বস্তু মাত্রই প্রতীতসমুৎপন্ন – এই নিয়ম অস্বীকৃত হয়, তাহলে অপ্রতীতসমুৎপন্ন স্বভাব ধর্ম এবং নির্হেতুক বস্তু সকলকে নিত্য বলতে হবে। সকল বস্তু নিত্য হলে ব্রহ্মচর্যাদি হবে অর্থহীন। কেননা বস্তু যদি প্রতীতসমুৎপন্ন না হয় তাহলে ব্রহ্মচর্যাদি উৎযাপনের দ্বারা কোনও ফলপ্রাপ্তি সম্ভব হবে না। এই অবস্থা কোনও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছেই অভিপ্রেত নয়। তাছাড়া বস্তু যে নিত্য হতে পারে না সে কথা বুদ্ধ নিজে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তার ধর্ম দেশনাতে। 'অনিত্য হি ভগবতা সর্বসংস্কারা নির্দিষ্টাঃ'[38] –ইত্যাদি উপদেশ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে সব পদার্থ প্রতীত্যসমুৎপন্ন, এবং ফলত অনিত্য।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অস্বীকার করলে কুশল পদার্থ কুশল ধর্ম সম্বন্ধে যে আপত্তি হবে সে কথা ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে। যা স্বভাব তার পরিবর্তন হতে পারে না। কারণ বস্তু স্বভাবকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে কুশলত্ব স্বভাবধর্ম হলে অনৈতিক থেকে নৈতিক জীবনে উত্তরনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। একই কথা অকুশল বস্তু এবং নৈর্যাণিক প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হবে। যদি বলা হয় সকল বস্তুই

---

[37] নাধর্মো ধর্মো বা সংব্যবহারাশ্চ লৌকিকান স্যুঃ। নিত্যাশ্চ সস্বভাবাঃ স্যুর্নিত্যত্বাদহেতুমতঃ।, তদেব, পৃ-৪৩।

[38] তদেব, পৃ-৪৩।

অপ্রতীতসমুৎপন্ন বা অ-হেতুক তাহলে বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস বলে আর কিছু থাকবে না। যার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্ভব কেবলমাত্র সেই বস্তুই সংস্কৃত হতে পারে। কিন্তু বস্তু মাত্রই যদি অহেতুক হয় তাহলে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বলে কিছুই থাকবে না। সেক্ষেত্রে বস্তুর সংস্কৃত ও অসংস্কৃত এরূপ ভেদ অর্থহীন হয়ে পরবে।[39]

পূর্বপক্ষী মনে করেন বস্তুর স্বভাব বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে ' নিঃস্বভাব' এই নামটিও নিরর্থক হয়ে পরে। কেননা বস্তুহীন নাম বলে কিছু হয় না। স্বভাব বলে যদি কিছু নাও থাকে তাসত্ত্বেও শূন্যবাদীর কাছে স্বভাবের অভাব বা স্বভাবহীনতা বলে কিছু অবশ্যই থাকবে। কিন্তু স্বভাবহীনতা বা নিঃস্বভাব নামই যদি সিদ্ধ না হয় তাহলে স্বভাবহীনতা বলেও তো কিছু থাকে না। কারণ এমন কোন নামই থাকতে পারেনা যা কোনও না কোনও বস্তুকে নির্দেশ করে না।[40] কিন্তু 'নিঃস্বভাব' এই কথা বা নামটি সিদ্ধ। অতএব স্বভাবহীনতা বলে কোনও স্বভাবও অবশ্য স্বীকার্য। এই পরিস্থিতিতে সকল বস্তুই স্বভাবশূন্য এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সহজ কথায় স্বভাবহীনতা যদি একটি স্বভাব হয় তাহলে বস্তু মাত্রই নিঃস্বভাব এমন দাবী আর স্বীকৃত হতে পারে না।

পূর্বপক্ষীর এরূপ আপত্তির উত্তরে নাগার্জুন 'বিগ্রহব্যবতনী' কারিকা ৫৭ তে বললেন 'যঃ সদ্ভূতং নামাত্র ব্রূয়াৎসস্বভাব ইত্যেবম্। ভবতা প্রতিবক্তব্যে নাম ব্রূমশ্চ ন বয়ং তৎ'[41]– বক্তব্য এই যাঁরা নাম মাত্রকেই সৎ বস্তুর জ্ঞাপক বা বাচক বলেন তাঁদের

---

[39] এবমকুশলেম্বব্যাকৃতেষু নৈর্যাণিকাদিষু চ দোষঃ। তস্মাৎসর্বং সংস্কৃতম সংস্কৃতং তে ভবত্যেব।, তদেব, পৃ-৪৩।

[40] যদি চ ন ভবেৎস্বভাবো ধর্মাণাং নিঃস্বভাব ইত্যেব। নামাপি ভবেন্নৈবং নাম হি নির্বস্তুকং নাস্তি।, তদেব, পৃ-১৭।

[41] তদেব, পৃ-৪৪।

দৃষ্টিতে নিঃস্বভাব নামটি হয়তো সত্তার বাচক কিন্তু শূন্যবাদীরা নাম মাত্রকেই সৎ বস্তুর জ্ঞাপক বলেন না। তাঁদের মতে সকল বিষয়ই শূন্য এবং সেকারণে নামও শূন্য। আর যা শূন্য তা অসদ্ভুত। এমতাবস্থায় নাম হিসাবে 'নিঃস্বভাব' এর সত্তা আছে এরকম কথা যুক্তি সিদ্ধ নয়। তাছাড়া 'নামাসৎ' এই নামটি কি কোন বিদ্যমান বস্তুকে নির্দেশ করে, নাকি অবিদ্যমান বস্তুকে? যদি বিদ্যমান বস্তুকে তা নির্দেশ করে তাহলে 'নাম হয় অসৎ' এরকম কথা পরিত্যক্ত হয়।[42] আর যদি তা অবিদ্যমান বস্তুকে নির্দেশ করে তাহলে নামকে আর সৎ বলার কোন উপায় থাকে না। ভাব পদার্থের কোন স্বভাব না থাকলে নিঃস্বভাব কোন নামও থাকতে পারে না- পূর্বপক্ষীর এই ধরনের বাক্যকে কোন সিদ্ধান্ত বাক্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না বলে নাগার্জুনের অভিমত। কারণ সব পদার্থই শূন্য তাই নামও শূন্য। নিঃস্বভাব নাম বলে কিছু হয় না- এই ধারণা ঠিক নয়।

কিন্তু বস্তুহীন নাম স্বীকার করার অর্থ বস্তু জগতের বাইরে কোন স্বভাব আছে বলে মেনে নেওয়া। অথচ বস্তু বা ধর্ম বর্জিত কোন স্বভাব যে আছে তার স্বপক্ষে ইতঃপূর্বে কোনও ব্যাখ্যা নাগার্জুন পেশ করেননি। কাজেই বস্তুশূন্য স্বভাবের কল্পনা অসিদ্ধ বলে পূর্বপক্ষী দাবী করতে পারেন।[43] কিন্তু পূর্বপক্ষীর এরকম আপত্তি বাস্তব সম্মত নয় বলে নাগার্জুন মনে করেন। কেননা বস্তু- বা ধর্মবিনির্মুক্ত কোনও স্বভাবের

---

[42] নামাসদিতি চ যদিদং তৎকিং নু সতো ভবত্যুতাপ্যসতঃ। যদি হি সতো যদ্যসতো দ্বিধাপি তে হীয়তে বাদঃ।, তদেব, পৃ-৪৫।

[43] অথ বিদ্যতে স্বভাবঃ স চ ধর্মাণাং ন বিদ্যতে তস্মাৎ। ধর্মৈর্বিনা স্বভাবঃ স যস্য তদুক্তমুপদেষ্টুম্।, তদেব, পৃ-১৮।

কথা মধ্যমক দর্শনের সমর্থকেরা কখনও বলেন না। সুতরাং এই আপত্তি প্রকৃত গ্রহণযোগ্য নয়।

বস্তুর স্বভাব যে অনস্বীকার্য, বস্তু স্বভাব স্বীকৃত না হলে তার প্রতিষেধ যে সিদ্ধ হতে পারে না সেকথা বলতে পারেন পূর্বপক্ষী। তিনি এই মর্মে যুক্তি আরোপ করতে পারেন-'গৃহে ঘট নেই' এমন কথা বললে এমন কিছু নিষেধ করা হয় যা স্পষ্টতই ভাব বা সত্তাশীল অর্থাৎ যার নিজস্ব ভাব আছে।[44] যার স্বভাব আছে বা যা অস্তিত্বশীল কেবল তারই নিষেধ সম্ভব, যার সত্তা বা অস্তিত্ব নেই তার নিষেধ সম্ভব নয়। কাজেই 'গৃহে ঘট নেই' বললে ভাব ঘটেরই নিষেধ হয়। একইভাবে 'বস্তুর স্বভাব নেই' এ কথা বললে এমন কিছুর প্রতিষেধ করা হয় যার ভাব বা অস্তিত্ব আছে। এমতাবস্থায় সব বস্তুই স্বভাবশূন্য এই বিবৃতি সিদ্ধ হয় না। প্রতিষেধের স্বার্থে প্রতিসেদ্ধ বিষয়ের সত্তা মানতে হয়। সকল বস্তুর স্বভাবের প্রতিষেধ বলে কিছু হয় না। তাই পূর্বপক্ষীর আপত্তি সকল বস্তুর স্বভাবের যদি স্বভাব বলে কিছু না থাকে তাহলে নাগার্জুন তার বাক্যর দ্বারা কিসের নিষেধ করবেন?[45] যা অসৎ তার অনস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন বহ্নিতে শীতলতার অভাব, জলে উষ্ণতার অভাব এগুলি প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি বা বাক্যের সাহায্যে বহ্নিতে শীতলতার প্রতিষেধ বাহুল্য মাত্র।

---

[44] সত এবপ্রতিষেধো নাস্তি ঘটোগেহ ইত্যয়ং যস্মাৎ। দৃষ্টঃ প্রতিষেধোৎয়ং সতঃ স্বভাবস্য তে তস্মাৎ।, তদেব, পৃ-১৮।

[45] অথ নাস্তি স স্বভাবঃ কিং নু প্রতিষিধ্যতে ত্বয়ানেন। বচনেনর্তে বচনাৎপ্রতিষেধঃ সিধ্যতে হ্যসতঃ।, তদেব, পৃ-১৯।

পূর্বপক্ষীর এরূপ আপত্তির উত্তরে নাগার্জুনের উক্তি 'সত এব প্রতিষেধো যদি শূন্যত্বং ননু প্রসিদ্ধমিদম্। প্রতিষেধয়তে হি ভবান্ ভাবানাং নিঃস্বভাবত্বম্'[46]। অর্থাৎ যদি শুধু মাত্র বিদ্যমানেরই প্রতিষেধ হয় তাহলে শূন্যতাই প্রসক্ত হয়। কারণ প্রতিষেধ কেবল সেই পদার্থেরই সম্ভব যার কোন স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় স্বভাব নেই। যা শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় তার প্রতিষেধ বলে কিছু হয় না। পূর্বপক্ষী উত্থাপিত আপত্তিটিকে তাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এইভাবে যদি কেবল ভাব পদার্থেরই প্রতিষেধ হয় তাহলে পূর্বপক্ষী যখন 'সকল ভাব পদার্থ নিঃস্বভাব' এই বচনের প্রতিষেধ করেন তখন আসলে তিনি ঐ বচনকে স্বীকারই করেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হল সর্বশূন্যতার প্রতিষেধ। প্রতিষেধ্য পদার্থ মাত্রই যদি সিদ্ধ হয় অর্থাৎ কেবল সিদ্ধিরই যদি প্রতিষেধ হয় তাহলে যে শূন্যতার প্রতিষেধ করতে তিনি উদ্যত সেই শূন্যতাও সিদ্ধ হয়। আর যদি তিনি শূন্যতাকে অস্বীকার করেন তাহলে 'প্রতিষেধ কেবল সিদ্ধেরই হয়' এই নিয়ম তাকে পরিত্যাগ করতে হয়[47] (ফলে সিদ্ধান্ত ব্যাঘাত হয়)।

অবশেষে নাগার্জুন বলেন যে তিনি কোন কিছুই প্রতিষেধ করছেন না। কেননা প্রতিষেধ্য বলেই তাঁর কাছে কোন কিছু নেই। এমতাবস্থায় যেহেতু তিনি প্রতিষেধ করছেন তাই তাকে প্রতিষেধ্যর সত্তা স্বীকার করতে হবে – পূর্বপক্ষী এমন অভিযোগ করতে পারে না। আর বহ্নিতে শীতলতার অভাবের মতো অসৎ বস্তু বাক্য ব্যাবহার

[46]তদেব, পৃ-৪৬-৪৭।

[47] প্রতিষেধয়সেৎথ ত্বং শূন্যত্বং তচ্চ নাস্তি শূন্যত্বম্। প্রতিষেধঃ সত ইতি তে নন্বেষ বিহীয়তে বাদঃ।, তদেব, পৃ-৪৭।

ছাড়াই প্রতিসিদ্ধ হয় এমন কথা বললে পূর্বপক্ষীর আপন বাক্য প্রয়োগ নিরর্থক হয়ে পরে। কেননা যে শূন্যতা অসৎ তার নিরাকরন কল্পে পূর্বপক্ষীর প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ। তাছাড়া শব্দ ব্যবহারের দ্বারা কোন কিছুর প্রতিষেধ করা হয় না, যা অসৎ তাকে প্রকাশ করা হয় মাত্র। দেবদত্তের গৃহে অনুপস্থিতি কালে কেউ যদি এমন বাক্য গঠন করে 'দেবদত্ত গৃহে উপস্থিত' এবং অন্য কেউ সেই বাক্যকে অস্বীকার করে বলে 'না, দেবদত্ত গৃহে অনুপস্থিত' তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির বাক্য দেবদত্তের অসৎ ভাব সৃষ্টি করে না, বরং সেই অসৎভাব – যা বাস্তবে রয়েছে তাকে জ্ঞাপন করে। একইভাবে 'ভাব পদার্থ নিঃস্বভাব' বাক্যটি ভাবের স্বভাব শূন্যতা সৃষ্টি করে না, তাকে জ্ঞাপন করে মাত্র। কাজেই স্বভাব শূন্যতা শব্দ ব্যবহার ছাড়াই প্রসিদ্ধ – এমন কথা বলা যায় না।

'সকল বস্তু নিঃস্বভাব' – এই উক্তির দ্বারা এমন বস্তুর স্বভাবের নিষেধ হয়, যার স্বভাব বলে কিছু নেই – নাগার্জুনের এই দাবী মেনে নিতে পূর্বপক্ষী নিমরাজি। কেননা মূর্খের যেমন মরিচিকায় জল ভ্রম হয় এবং অভিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষের দ্বারা সেই ভ্রম দূরও হয়, তেমনি 'সকল বস্তু নিঃস্বভাব' বাক্যের দ্বারা স্বরূপত শূন্য বস্তুর স্বভাব বিষয়ে ভ্রম দূর হতে পারে- একথা যদি মেনেও নেওয়া হয় তবুও পূর্বপক্ষীর দাবীর সঙ্গে নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ের সংঘাত অবশ্যই থাকবে – প্রত্যক্ষ(গ্রাহক), প্রত্যক্ষের বিষয়(গ্রাহ্য), প্রত্যক্ষকর্তা(গ্রহীতা), প্রতিষেধ বা নিষেধ, প্রতিষেধ্য বা নিষেধ্য এবং নিষেধক বা প্রতিষেধক।[48] সুতরাং যে মিথ্যা বিষয়ের প্রতিষেধ নাগার্জুনের ঈপ্সিত তার

[48] নন্বেবং সত্যস্তি গ্রাহো গ্রাহ্যং চ তদগ্রহীতা চ। প্রতিষেধঃ প্রতিষেধ্যং প্রতিষেদ্ধা চেতি ষটকমতৎ।, তদেব, পৃ-১৯।

অস্তিত্ব যেমন স্বীকার্য তেমনি প্রতিষেধের কর্তা হিসাবে নাগার্জুনের অস্তিত্বও স্বীকার্য। এমতাবস্থায় 'সবকিছুই নিঃস্বভাব' এই বাক্য অসিদ্ধ হয়ে পরে। আর যদি তিনি বলেন যে প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের বিষয় বা প্রত্যক্ষের কর্তা বলে কিছু নেই সেক্ষেত্রে প্রতিষেধ, প্রতিষেধ্য এবং প্রতিষেধক বলে কোনও কিছু যেমন থাকবে না তেমনি যে বাক্যের দ্বারা তিনি স্বভাবের নিষেধ করছেন সেই নিষেধক বাক্যটিও থাকবে না। আরও কথা প্রতিষেধ, প্রতিষেধ্য, প্রতিষেধক বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে সব পদার্থ অপ্রতিষেধ্য হয়ে পরবে। যা অপ্রতিষেধ্য তা যেমন সিদ্ধ তেমনি তার স্বভাবও সিদ্ধ।[49] ফলস্বরূপ স্বভাবেরই সিদ্ধি হবে, স্বভাব শূন্যতার নয়।

মরীচিকায় মিথ্যা জল দর্শনের যে দৃষ্টান্ত পূর্বপক্ষী দিয়েছেন নাগার্জুনের কাছে তা অত্যাশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয়েছে। কেননা এটি সঠিক উপমা নয়। যদি ঐ মরিচিকা প্রত্যক্ষ স্বভাব হয় তাহলে তাকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন তথা শূন্য বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু ঐ জল দর্শন মরিচিকা দর্শন সাপেক্ষ তাই তাকে প্রতীত্যসমুৎপন্নই বলতে হয়। যা প্রতীত্যসমুৎপন্ন তা স্বভাব শূন্য না হয়েই পারে না। পক্ষান্তরে মরচিকায় জল দর্শন যদি স্বভাবসম্পন্ন হতো তাহলে কারও দ্বারা তার নিবৃত্তি হতো না, কেননা স্বভাব মাত্রই অনপনেয়। অগ্নির দাহিকা, জলের দ্রব্যত্ব ইত্যাদি যেমন তদতদ পদার্থের স্বভাব হওয়ার কারণে অপরিবর্তনীয় তেমনি ঐ জল দর্শনও অপরিবর্তনীয় হতো অথচ ঐ জল দর্শনের নিবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং পূর্বপক্ষীর আপত্তি গ্রাহ্য নয়।

---

[49] প্রতিষেধঃ প্রতিষেধ্যং প্রতিষেদ্ধারশ্চ যদ্যুত ন সন্তি। সিদ্ধা হি সর্বভাবাস্তেষামেব স্বভবশ্চ।, তদেব, পৃ-২০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায় কর্তৃক বৈতণ্ডিক মত নিরসন ও প্রমাণ-প্রমেয়ের প্রতিষ্ঠা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা আলোচনা করেছিলাম সংশয়বাদীরা (বৈতণ্ডিক) বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা কীভাবে জ্ঞানের দাবীকে অস্বীকার করেছেন। যদিও বৈতণ্ডিকদের যুক্তির মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁরা জ্ঞানের দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য যে যুক্তিগুলি প্রদান করেন সেগুলি প্রায় একই ধরনের। যুক্তির ধরণটি ছিল মূলত এইরকম- যেহেতু প্রমা করণ বা প্রমাণের সপক্ষে যথার্থ জোরালো যুক্তি নেই সেহেতু প্রমাণ বলে কিছু নেই। আর যেহেতু প্রমাণ নেই সেহেতু বাস্তবে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা বলে কোনও কিছু থাকা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় একমাত্র উপায় হল প্রমাণবাদীরা অপ্রমাণবাদীদের বিরোধিতা করে প্রমা করণ প্রমাণের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাই মহর্ষি গৌতমের মতো প্রমাণবাদীদের কাছে এটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় প্রমাণের বৈধতা রক্ষার জন্য প্রমাণের লক্ষণগুলিকে দ্রুত পরীক্ষা করা। সেই উদ্দ্যেশ্যে ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্রে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণের লক্ষণের যাথার্থ্য বজায় রাখার জন্য পুনরায় পরীক্ষা করেন।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে মহর্ষি গৌতম যে প্রমাণের লক্ষণের পুনরায় পরীক্ষা করছেন তা কি আদৌও প্রাসঙ্গিক? উত্তরস্বরূপ বলা যেতে পারে ধরাযাক, কেউ বলতে পারেন পুনরায় প্রমাণের লক্ষণের পরীক্ষা করা অপ্রাসঙ্গিক এবং নিস্ফল। ভারতীয় দর্শনে প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই প্রমাণ-প্রমেয়ের বিভাজন মানেন। এমনকি প্রমাণ-প্রমেয়ের এই বিভাজন আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায়

সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রমাণ-প্রমেয়ের সপক্ষে কোনও যুক্তিপ্রদান করা সম্ভব নয়। এই সাধারণ উপলব্ধিটি উদ্যোতকরের লেখনির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তিনি বলেন আদৌও কী প্রমাণ-প্রমেয়ের পরীক্ষা করা সম্ভব?[1] আবার এই সমস্যাটিকে বাচস্পতি মিশ্র ভিন্নভাবে উত্থাপন করেন। তিনি বলেন প্রমাণ যা উপলব্ধি সাধনা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত তা বর্তমানেও বিদ্যমান। যদি এটি ঘটনা হয় তাহলে কেন তাঁরা পরীক্ষার কথা বলছেন? এমনকি যে ব্যক্তি প্রায় সবকিছুর সত্তাকে অস্বীকার করেন তিনিও তাঁর নিজের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণের কথা বলেন। আবার অনেকসময় এটা ঘটতে দেখা যায় যে, কোনও ব্যক্তি তাঁর নিজের মতের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও যুক্তি প্রদান করেন না। বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই ব্যক্তি (যার নিজের কোনও যুক্তি বা তত্ত্ব নেই) যেমন- কোনও সাধারণ মানুষ হতে পারে না, তেমনি কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তিও হতে পারে না। বরং এই ব্যক্তি উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়।[2] এখানে অভিপ্রায় এটাই যে, যে ব্যক্তির কোনও যৌক্তিক বা তাত্ত্বিক অবস্থান নেই সেই ব্যক্তির সঙ্গে যৌক্তিক বিবাদ করে সময়য় নষ্ট করা নিছক মূল্যহীন। যে কোনও দায়িত্ববান প্রতিবাদীর নিজের অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য প্রমাণ স্বীকার করা অত্যাবশ্যক। কোনও ব্যক্তির কাছে যদি প্রমাণের স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক হয় এবং সেটি যদি অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণযোগ্য হয় তাহলে নৈয়ায়িকের প্রমাণের সপক্ষে কোনও যুক্তিপ্রদান করা অর্থহীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও এটা লক্ষ করা যায় যে,

[1] 'আদৌ তাবৎ সম্ভব?' উদ্দ্যোতকরঃ ন্যায়ভাষ্যবার্তিক, সম্পাদক- অনন্তলাল ঠাকুর, ইন্ডিয়ান কউন্সিল অফ্ ফিলজফিকাল রিসার্চ, নিউ দিল্লি, ১৯৯৭, পৃঃ-১৭৯।

[2] তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪১৯।

মহর্ষি গৌতম সংশয় পরীক্ষার ঠিক পরেই 'ন্যায়সূত্রে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণের বৈধতা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা করেন। সুতরাং এর থেকে গ্রন্থকারের নিজের অবস্থানের মধ্যেই একটা বৈমত্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বাস্তবত 'ন্যায়সূত্রে'র গ্রন্থকার প্রমাণের যে পরীক্ষা করেছিলেন তারমধ্যে কোনও বৈমত্য নেই বলে মনে হয়। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং দর্শনশাস্ত্রে তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে কিছু দার্শনিক আছেন যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে প্রমাণবাদীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এমন অবস্থায় প্রমাণের পরীক্ষা করা কোনও দোষের নয়। কারণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষত ন্যায়দর্শনে প্রথমে কোনও কিছুর 'উদ্দেশ' করা হয়। তারপর সেই উদ্দেশের লক্ষণ প্রদান করা হয়, তারপর সেই লক্ষণের পরীক্ষা করার প্রচলন বিদ্যমান। তাই মহর্ষি গৌতম ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের রীতি মেনে প্রথমে প্রমাণের উল্লেখ করে তারপর তার লক্ষণ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে প্রমাণের বৈধতার জন্য যে পরীক্ষা করেন তা কোনও অসুবিধার নয়; বরং তা শাস্ত্রকে বাঁচানোর প্রয়াস। প্রমাণ পরীক্ষা যে গুরুত্বপূর্ণ তা যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকর। তিনি বলেন যে সকল বস্তুর পরীক্ষার পূর্ববর্তী হিসাবে যেমন সংশয় থাকা যথাযথ তেমনি প্রমাণ পরীক্ষার পূর্ববর্তী হিসাবে সংশয় থাকা যথাযথ। এখন প্রমাণের ক্ষেত্রে যদি তাই হয় তাহলে উদ্দ্যোতকর মনে করেন তখন আমাদের মধ্যে আদৌও কি প্রমাণ বলে কিছু থাকা সম্ভব? আদৌও কি সৎ অথবা অসৎ ধর্মগুলি প্রমাণের মধ্যে আছে? এরূপ সংশয়ের উদ্ভব হবে।[3] এরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হল প্রমাণ নিজেই কোনও এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রমেয়। আর

---

[3] 'কিম্ প্রমাণানি সনত্যুতা না সন্তীতি....' উদ্দ্যোতকরঃ ন্যায়ভাষ্যবার্তিক, সম্পাঃ অনন্তলাল ঠাকুর, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ ফিলজফিকাল রিসার্চ, নিউ দিল্লি, ১৯৯৭, পৃঃ-১৭৯।

প্রমাণ নিজেই প্রমেয় হওয়ার জন্যই সৎ, অসৎ এইরূপ বিভাগ যথাযথ। প্রমাণের মধ্যে কোনও বিশেষ ধর্ম লক্ষ করা যায় না। ফলে বিশেষ ধর্ম এবং সাধারণ ধর্মের জ্ঞানের লক্ষ্য না হওয়ার জন্য প্রমাণের প্রকৃতি সম্পর্কে সংশয় উৎপন্ন হয়। তাই ন্যায়বার্তিককার মনে করেন এইরূপ সংশয়কে দূর করার জন্যই সূত্রকার গৌতম প্রমাণের পরীক্ষা করেছেন।

গৌতম প্রদত্ত প্রমাণের পরীক্ষাটিকে বাচস্পতি মিশ্র আবার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে প্রতিবাদীরা (অপ্রমাণবাদীরা) মনে করেন যেহেতু প্রমাণ বলে এইরূপ কোনও শব্দ নেই সেহেতু কোনোকিছু পরীক্ষারও প্রয়োজন নেই। যাইহোক প্রমাণের সত্তা বিষয়ে যেহেতু সংশয় উত্থাপিত হয় তাই প্রমাণবাদীদের কাছে তার পরীক্ষা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। আর সেইজন্য প্রমানবাদী হিসাবে মহর্ষি গৌতম যে প্রমাণের পরীক্ষা করেছেন তার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি লক্ষ করা যায় না।

অপ্রমাণবাদীরা প্রমাণের দাবীকে নস্যাৎ করতে গিয়ে বিশেষত প্রমাণ যে ত্রিকালে অস্তিত্বহীন তার সপক্ষে যে সকল যুক্তিপ্রদান করেছিলেন নৈয়ায়িকরা সেইসকল যুক্তিগুলিকে যথাযথ বলে মনে করেন না। অপ্রমাণবাদীরা বলেছিলেন প্রমাণ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে বিদ্যমান নয়। আর যেহেতু প্রমাণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে অবিদ্যমান সেহেতু তা অসৎ। ফলস্বরূপ, প্রমাণ যখন অসৎ তখন তা সৎ না অসৎ এই বিষয়ে সংশয় করা যায় না। আরও বলা যায় যে প্রমাণ এবং প্রমেয়কে কখনোই সংশয়ের বিষয়বস্তু হিসাবে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং প্রমাণবাদীরা যে প্রমাণের পরীক্ষা করেন সংশয়কে দূর করার জন্য তা অবৈধ। মহর্ষি গৌতম

অপ্রমাণবাদীদের উক্ত আপত্তিটির তীব্র বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন প্রতিবাদীরা (অপ্রমাণবাদী) প্রমাণকে যে অসৎ বলেন বা প্রমাণের বিরুদ্ধে যে যুক্তিপ্রদান করেন তা যথাযথ নয়। তাই তিনি শুরুতেই প্রতিবাদীর দাবীর দৃঢ়তাকে জেনে সেগুলিকে উত্থাপন করে পুনরায় খণ্ডন করেন। মহর্ষি গৌতম অপ্রমাণবাদীদের যুক্তিগুলিকে নিম্নোক্ত অনুমানের সাহায্যে তুলে ধরেন। অনুমানটি হল- 'প্রত্যক্ষাদীনাম্ প্রামান্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ'[4] অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলি অবৈধ। কারণ সেগুলি তিনকালের কোনও কালেই সিদ্ধ নয়। আবার ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গ্রন্থকারের অভিপ্রায়টি বুঝে বলেন 'প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং নাস্তি, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ পূর্ব্বাপর-সহভাবানুপপত্তেরিতি'।[5] অর্থাৎ প্রমাণ ত্রিকালে অসিদ্ধ। তাই প্রমাণের পূর্ব, পর এবং যুগপতেসিদ্ধি অসম্ভব। আর যেহেতু প্রমাণ অসম্ভব সেহেতু প্রত্যক্ষের বৈধতাও অসম্ভব হয়ে পরে। এই বিষয়ে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং বাচস্পতি মিশ্র তাঁর পূর্বসূরীদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। বিশ্বনাথ বলেন 'কালত্রয়েপি প্রমানাৎ প্রমায়াঃ সিদ্ধেরব্যক্তুমঅশক্যতবাৎ প্রত্যক্ষাদীনাম্ ন প্রামান্যামিত্যার্থঃ'।[6] এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি সমস্যার উত্থাপন করেন। সমস্যাটি হল পদার্থের বিভাগ করার সময় বিভাগক্রম লঙ্ঘিত হয়েছে। কারণ বিভাগক্রমে সংশয়ের স্থান প্রমাণ, প্রমেয়ের পরে লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রমাণ, প্রমেয়ের পূর্বেই সংশয়ের পরীক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে

---

[4] ন্যায়সূত্র, ২।১।৮।

[5]তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪১৯।

[6] উদ্দ্যোতকরঃ ন্যায়ভাষ্যবার্তিক, সম্পাঃ অনন্তলাল ঠাকুর, ইন্ডিয়ান কউন্সিল অফ্ ফিলজফিকাল রিসার্চ, নিউ দিল্লি, ১৯৯৭, পৃঃ-১৭৯।

গৌতম পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশয়কে প্রমাণ, প্রমেয়ের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বাচস্পতি মিশ্র মনে করেন পদার্থের বিভাগের ক্রমান্বয়ের ধারাটি লঙ্ঘিত হয়েছে। ফলে শুরুতেই এটিকে অবৈধ বলে মনে করা হয়। তবে পদার্থের বিভাগের ক্রমান্বয়ের ধারার পরিবর্তনের পিছনে যে সুপ্ত কারণ লুক্কায়িত সেটিকে জানলে আর কোনও অসঙ্গতি থাকবে না। সাধারণত কোনোকিছুর পরীক্ষার পূর্ববর্তী হল সংশয়। কারণ তখনই কোনোকিছু পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় যখন সেই বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। প্রমাণ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রমাণ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই ধারা বজায় রাখা হয়েছে। আর এই বাস্তবিক আবশ্যিকতাকে মাথায় রেখে মহর্ষি গৌতম পদার্থের বিভাগের ক্রমান্বয়ের ধারণাটির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রথমেই সংশয়ের পরীক্ষা করেন। তারপর বিশেষ প্রমাণের পরীক্ষার পূর্বেই প্রমাণের সামান্য লক্ষণের পরীক্ষা করেন, কারণ এটি হল পরীক্ষার বৈধ নিয়ম। মহর্ষি গৌতম প্রমাণের সম্ভাব্যতা বিষয়ে প্রতিবাদীদের (অপ্রমাণবাদী) আপত্তিটিকে পূর্বানুমান করে বলেন 'প্রত্যক্ষাদীনাম্ প্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ'।[7] এখন দেখে নেওয়া যাক প্রতিবাদীরা ঠিক কি কি যুক্তি দিয়েছিলেন প্রমাণ প্রমেয়ের অসত্তা প্রতিপাদন করার সপক্ষে। তাঁদের যুক্তি হল – প্রমাণ এবং প্রমেয় একে অপরের সঙ্গে সম্মন্ধযুক্ত না হয়ে কখনোই থাকতে পারে না। কারণ প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বে থাকতে পারে না, পরে থাকতে পারে না, আবার উভয়ে যুগপৎ থাকা সম্ভব নয়। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে কেনই বা প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বে, পরে ও যুগপৎ থাকতে পারে না? এর উত্তর দিতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম

[7] ন্যায়সূত্র, ২।১।৮।

বলেন ‘পূর্ব্বাংহি প্রমাণসিদ্ধৌনেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ’।[৪] অর্থাৎ প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্বে থাকে তাহলে ইন্দ্রিয় বিষয়ে সন্নিকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেটি আর উৎপন্ন হবে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলেই প্রত্যক্ষজ্ঞান, এছাড়া আরও অন্যান্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মহর্ষি গৌতম তাঁর সূত্রে প্রত্যক্ষকে একটি জ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করেন। যেটি ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্বে থাকে তাহলে স্ববিরোধীতা দেখা দেবে। এই বিষয়টি বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাৎস্যায়ন বলেন যদি গন্ধ প্রত্যক্ষকে গন্ধের পূর্ববর্তী হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে এটি কখনও বলা যাবে না গন্ধ এবং ঘ্রানেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থেকেই গন্ধের প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বাচস্পতি মিশ্র উপর্যুক্ত বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, ‘জ্ঞানং হি প্রমাণং তদ্যোগাৎপ্রমেয়মিতি চার্থ ইতি চ ভবতি’।[৫] অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকে প্রমাণ হিসাবে ধরে নিয়ে বলেন জ্ঞানের সঙ্গে অথবা প্রমাণের সঙ্গে প্রমেয় অথবা জ্ঞেয় সম্বন্ধ হয়েই প্রমেয়টি বুদ্ধিগম্য হয়। আর এখন যদি এটাই ঘটনা হয় যে প্রমেয় বা বিষয়বস্তুর নিরিখে প্রমাণ পূর্ববর্তী হিসাবে সিদ্ধ তাহলে প্রমাণ উৎপত্তির পূর্বে কোনও বস্তু বা প্রমেয় থাকবে না। আর যদি প্রমাণ উৎপত্তির আগে প্রমেয় না থাকে তাহলে সূত্রকারের সূত্রের ‘ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নম্...’ লঙ্ঘন হয়ে যাবে। এখানে বলে রাখা দরকার যে মহর্ষি গৌতম তাঁর ‘ন্যায়সূত্রে’র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণের কথা বলতে গিয়ে ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষের কথা বলেছিলেন। আর এই ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন

---

[৪] ন্যায়সূত্র, ২।১।৯।

[৫]তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪২০।

হয় সেটাই প্রত্যক্ষ। এখন জ্ঞানের পূর্বে যদি বিষয় না থাকে তাহলে সূত্রকারের উপর্যুক্ত সূত্রটিকে আর যথাযথ বলে দাবী করা যাবে না। এটা স্পষ্ট যে, ইন্দ্রিয় বিষয় সন্নিকর্ষ থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে প্রমাণের উপস্থিতির পূর্বে প্রমার উপস্থিতি আবশ্যক। যদি উপর্যুক্ত মতটিকে স্বীকার করা হয় তাহলে এটা বলা সম্ভব যে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান থেকেই ইন্দ্রিয় বিষয় সন্নিকর্ষ উৎপন্ন হয়। এর বিপরীতটি হয় না। আর এরূপ ব্যাখ্যা থেকে যে কেবলমাত্র গৌতমপ্রদত্ত সূত্রের লঙ্ঘনই হয় না, বরং সূত্রের অভিপ্রায়ের অপব্যাখ্যা করা হয়।

আবার প্রমাণ যে প্রমেয়ের পরে সিদ্ধ হতে পারে না সেটিকে দেখাতে গিয়ে গৌতম বলেন ‘পশ্চাৎসিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যোঃ প্রমেয়াসিদ্ধিঃ’।[10] অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের পরে সিদ্ধ নয়। কারণ যদি প্রমাণ প্রমেয়ের পরে সিদ্ধ হয় তাহলে কখনই এই দাবী করা যাবে না যে প্রমেয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। গৌতমের এই উক্তিটিকে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে যদি প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ না থাকে তাহলে বিষয়ের জ্ঞান কীভাবে হবে? কাকেই বা প্রমেয় বলে গণ্য করা হবে? তখনই একটি বস্তু প্রমেয় হিসাবে গণ্য হয় যখন সেটি কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। প্রমাণ না থাকলে কখনই একটি বস্তুর যথাযথ জ্ঞান হয় না, এমনকি তাকে কখনই প্রমেয় হিসাবে আখ্যায়িত করা সম্ভব হয় না। আবার বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই বিষয়টিকে বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ‘প্রমাণস্য প্রমাতঃ পশ্চাৎসিদ্ধৌ বিষয়স্য প্রমেয়ত্বম্ প্রমাণাৎ পূর্বমেব

[10] ন্যায়সূত্র, ২।১।১০।

সিদ্ধমিতি ন প্রমাণতঃ প্রমেয়া উৎপত্তি প্রমেয়স্য চ জ্ঞাপ্তিরিতিঃ’।[11] অর্থাৎ যদি প্রমেয়ের নিরিখে প্রমাণ পরে সিদ্ধ হয় তাহলে কোনও বস্তুর প্রমেয়ত্ব প্রমাণের পূর্বেই সিদ্ধ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, প্রমাণ দ্বারা যেমন প্রমেয় উৎপন্ন হবে না তেমনি প্রমেয় কোনোকিছুকে সিদ্ধ করতে পারবে না। তাই এটা স্পষ্ট যে প্রমাণ-প্রমেয়ের সম্বন্ধকে কখনই একে অপরের পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এখনও প্রশ্ন থেকে যায় যে প্রমাণ-প্রমেয়ের মধ্যে কি যুগপৎ সম্মন্ধ আছে? উক্ত প্রশ্নের নিরিখে অপ্রমাণবাদীরা বলেন প্রমাণ-প্রমেয়ের মধ্যে কোনও যুগপৎ সম্মন্ধ নেই। মহর্ষি গৌতম অপ্রমাণবাদীদের উপর্যুক্ত যুক্তিটিকে পূর্বানুমান করে (নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে) বলেন ‘যুগপৎসিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাব বুদ্ধিনাম’।[12] অর্থাৎ যদি প্রমাণ প্রমেয়ের মধ্যে যুগপৎ সম্মন্ধ সিদ্ধ হয় তাহলে আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্বাপর সম্মন্ধ সিদ্ধ হয় না। এছাড়া প্রত্যেকটি জ্ঞান তাঁর নিজস্ব বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পরবে। আরও বলা যায় যে, যদি সকল প্রমাণ প্রমেয় যুগপৎ সিদ্ধ হয় তাহলে একই সময়ে সকল বস্তুর জ্ঞান হয়ে যাবে। ফলে জ্ঞানের মধ্যে আর কোনও পূর্বাপর সম্মন্ধ থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্বাপর সম্মন্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়ে থাকে। সুতরাং ‘প্রমাণ প্রমেয় যুগপৎ সিদ্ধ’ -এটি গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ‘পূর্বাপর’ এই নিয়মটির যেমন উৎখাত হয় তেমনি একইসঙ্গে গৌতম প্রদত্ত ‘যুগপজ্ জ্ঞানানুৎপত্তির্ম্মনসো লিঙ্গম্’[13] এই সূত্রটি অসত্য বলে প্রমাণিত হয়।

---

[11]তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪২১।

[12] ন্যায়সূত্র, ২।১।১১।

[13] ন্যায়সূত্র, ১।১।১৬।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আবার উপর্যুক্ত সমস্যাটিকে উত্থাপন করতে গিয়ে বলেন যদি প্রমাণ এবং প্রমেয়কে যুগপৎসিদ্ধ বলা হয় তাহলে গন্ধের জ্ঞানের সময় অন্যান্য সকল বস্তুর জ্ঞান একইসময়ে হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি অপরিবর্তনীয়ভাবে সকল জ্ঞানের বিষয় উপস্থিত হয় তাহলে সকল বস্তুর জ্ঞান যুগপৎ সিদ্ধ হয়ে যায়। আর এটি সত্য হলে পূর্বাপরভাবে যে জ্ঞানোৎপত্তি হতে দেখা যায় সেটি অসম্ভব হয়ে পরে। এছাড়া মহর্ষি গৌতম মনের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের সপক্ষে যে হেতুটি দিয়েছিলেন (দুটি জ্ঞান যুগপৎ সিদ্ধ হতে পারে না) সেটি নিরর্থক হয়ে পরে। সুতরাং প্রমাণ-প্রমেয় যুগপৎসিদ্ধ – এরূপ বিকল্পটি যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের পৌর্বাপর্য নিয়মটি লঙ্ঘিত হবে এবং পূর্বে উত্থাপিত মহর্ষি প্রদত্ত মনের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রদত্ত সূত্রটিরও লঙ্ঘন হবে। তাছাড়া জ্ঞানের যুগপৎসিদ্ধি যে সম্ভব নয় সেটি মহর্ষি গৌতম তাঁর ‘ন্যায়দর্শন’-এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের পনেরো নম্বর সূত্রে (১।১।১৫) উল্লেখ করেছিলেন। যদি প্রমাণ-প্রমেয় যুগপৎ সিদ্ধ হয় তাহলে একই সময়ে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে যাবে। ফলে নিশ্চিতভাবে পূর্বোক্ত সূত্রের লঙ্ঘন হবে। কারণ গৌতম প্রদত্ত সূত্রে উল্লিখিত ‘প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ’ এই বক্তব্যটির দ্বারা বোঝানো হয় যে জ্ঞানের থেকে বিষয় (প্রমেয়) ভিন্ন। প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন আকারের জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা প্রমেয় থাকে। আর যেহেতু জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে তফাৎ থাকে সেহেতু বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যেও অবশ্যই পার্থক্য থাকে। আর এইজন্যই প্রমাণ প্রমেয় যুগপৎ সিদ্ধ এটা দাবী করা যায় না। যেহেতু জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে ক্রমান্বয় বা পূর্বাপর সম্মন্ধ থাকে সেহেতু ‘প্রমাণ-প্রমেয় যুগপৎ সিদ্ধ’ এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আবার বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে যেহেতু বিষয়ভেদে প্রত্যেক জ্ঞানের আকার ভিন্ন

ভিন্ন হয় সেহেতু জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে পূর্বাপর বা ক্রমান্বয় সম্মন্ধ স্বীকৃত। প্রমাণ-প্রমেয়ের মতো জ্ঞানও যুগপৎসিদ্ধ হতে পারে এটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম যে অনুমানটি দিয়েছিলেন সেটি হল 'যুগপৎসিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাব বুদ্ধিনাম'। কিন্তু বিশ্বনাথ প্রমাণ-প্রমেয় যুগপৎসিদ্ধ এটি দেখাতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মত প্রদান করেন, সেটি হল 'প্রমাণপ্রমেয়র্যুগোপৎসত্বে যুগপদুৎপত্তে, বুদ্ধিনামর্থে বিশেষনুয়ৎতাত্বাৎ যৎ ক্রমবৃত্তিত্বং তন্নস্যাৎ...'।[14]

কোনও মতবাদ বা তত্ত্বের খণ্ডন করতে গেলে প্রথমে দরকার সেই মতবাদ বা তত্ত্বটি যথাযথভাবে উত্থাপন করা। আর এই ধারণাটিকে মাথায় রেখে সকল ভারতীয় দার্শনিকগণ তাঁদের নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে প্রতিবাদী প্রদত্ত মতবাদ বা তত্ত্বটিকে আগে উত্থাপন করেন। মহর্ষি গৌতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তার ব্যতিক্রম নন। তাই তাঁরাও মাধ্যমিক প্রদত্ত প্রমাণ-প্রমেয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে যেসকল যুক্তি উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলিকে খণ্ডনের পূর্বে পুনঃউত্থাপন করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেন। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রের ২।১।১২ তে প্রতিবাদীদের যুক্তির উত্তর দিতে গিয়ে তাদের মতো করে বলেন 'ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ' অর্থাৎ তাঁর মতে যদি প্রমাণ-প্রমেয় সম্মন্ধ ত্রিকালে সিদ্ধ না হয় তাহলে প্রতিবাদীরা যে প্রমাণ অস্বীকার করেন সেটি প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর এটি অপ্রমাণবাদীদের (প্রতিবাদী) যুক্তির বিরুদ্ধে একটি সাধারণ উত্তর। আবার ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বিষয়টিকে বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যদি প্রমাণ, প্রমেয়ের মধ্যে কোনও কালে কোনও সম্মন্ধ না থাকে তাহলে

[14]তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪২২।

ত্রিকালে অসিদ্ধ এটিও অসম্ভব হয়ে পরে। কারণ যদি অস্বীকার (নিষেধ) কে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে প্রতিবাদীকে বলতে হবে অস্বীকারকৃত উক্তি (denial statement) এবং অস্বীকৃত বস্তুর (denied thing) মধ্যে কী সম্মন্ধ আছে? যদি অস্বীকৃত উক্তি অস্বীকৃত বস্তুর পূর্ববর্তী হয় তাহলে বস্তুর অনুপস্থিতিতে সেটি আর গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ বস্তুর অনুপস্থিতিতে অস্বীকৃত উক্তির দ্বারা বস্তুর অস্বীকার কি আদৌও সম্ভব?[15] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও বস্তুর অনুপস্থিতিতে সেই বস্তুকে কোনোভাবে নিষেধ বা অস্বীকার করা যায় না। আবার যদি বলা হয় অস্বীকারকৃত উক্তি বা নিষেধ উক্তি হল অস্বীকৃত বস্তুর পরবর্তী তাহলে অস্বীকৃত উক্তিটি ব্যর্থ হয়ে পরে।[16] কারণ যে বস্তু আগে থেকেই সিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত তা পরবর্তীকালে আর অস্বীকৃতির বিষয় হতে পারে না বা তাকে আর কোনও উক্তির দ্বারা অস্বীকার করা যায় না। আবার যদি বলা হয় যে, অস্বীকৃত উক্তি এবং নিষেধ বস্তু যুগপৎ সিদ্ধ বা একইসময়ে বিদ্যমান তাহলে অস্বীকৃত উক্তিটি অর্থহীন হয়ে পরে। কারণ যে বস্তুর অস্বীকার করা হয় তখন সেটি বিদ্যমান বা সিদ্ধ।[17] আর এইভাবে অস্বীকৃত উক্তি অসিদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর যেহেতু অস্বীকৃত উক্তিটি অসিদ্ধ সেহেতু অস্বীকৃত উক্তির সাহায্যে যে প্রমাণের

[15] 'পূর্ব হি প্রতিষেধসিদ্ধাবসতি প্রতিষেধ্যে কিমনেন প্রতিষিধ্যতে', তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪২৫।

[16] 'পশ্চাৎসিদ্ধৌ প্রতিষেধ্যাসিদ্ধিঃ প্রতিষেধাভাবাদিতি', তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪২৫।

[17] 'যুগপৎ সিদ্ধৌ প্রতিষেধ্যসিধ্যানুজ্ঞানাদনর্থকঃ প্রতিষেধ ইতি', তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪২৫-২৬।

দাবীটিকে অস্বীকার করা হয়েছিল সেটি অসম্ভব এবং অযথার্থ হয়ে পরে। ফলে প্রমাণের বৈধতার দাবীটি অটুট থাকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত অপ্রমাণবাদী (প্রতিবাদী) প্রদত্ত 'প্রমাণ অবৈধ' এরূপ দাবীর বিরুদ্ধে প্রমাণবাদীরা (নৈয়ায়িকরা) যেসব যুক্তি দিয়েছিলেন সেগুলি আলোচিত হয়েছে। এখন আমরা কীভাবে প্রমাণ-প্রমেয়ের মধ্যে সম্মন্ধ স্থাপন করা যায় সেটি নিয়ে আলোচনা করছি। এটা স্পষ্ট যে, অপ্রমাণবাদীরা প্রমাণের অবৈধতা প্রমাণের জন্য যে অনুমান প্রদান করেছিলেন (যেটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সেই অনুমানের হেতু হল ত্রৈকাল্যাসিদ্ধত্ব। এখন যদি প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এমন হয় যে 'ত্রৈকাল্যাসিদ্ধত্ব'কে হেতু হিসাবে ব্যবহার করা তাহলে তাঁকে আরও কিছু উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রদান করতে হবে এবং উদাহরণ দিতে গেলেই প্রতিবাদীকে প্রমাণের প্রামাণিকতাকে স্বীকার করতে হবে। কারণ প্রতিবাদী যদি প্রমাণের প্রামাণ্যকে স্বীকার না করেন তাহলে তিনি কখনই তাঁর যুক্তির অনুকূলে উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রদান করতে পারেন না। আবার যদি প্রতিবাদী প্রমাণের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেন তাহলে তখন প্রমাণের প্রামাণ্য বিশেষত প্রত্যক্ষের বৈধতাকে অস্বীকার করা তারপক্ষে সম্ভব নয়। তাই 'ত্রৈকাল্যাসিদ্ধত্ব'কে হেতু করে প্রতিবাদী যে প্রত্যক্ষের অবৈধতা প্রমাণ করেন সেটি অযৌক্তিক হয়ে পরে। কারণ প্রতিবাদীকে অন্ততপক্ষে সেই প্রমাণের প্রামাণ্যকে স্বীকার করতেই হয় যার ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর বচনটি গঠন করেন এবং ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ফলে যেহেতু তাঁকে কোনও একটি প্রমাণের প্রামাণ্যকে মেনে নিতে হয় সেহেতু 'সকল প্রমাণ হয় অবৈধ' এরূপ দাবীটির মধ্যে স্ববিরোধীতা দেখা যায়। আরও বিশদে বলা যেতে পারে যে, যদি কোনও প্রমাণের প্রামাণ্যকে স্বীকার না করা হয় তাহলে প্রমাণের অবৈধতা প্রতিষ্ঠা করা

যায় না। কারণ কোনও ব্যক্তি তখনই কোনোকিছুর অবৈধতা প্রমাণ করতে পারে যখন তার মধ্যে বৈধতার প্রাক্-স্বীকৃতি থাকে। তাই প্রমাণের অনুপস্থিতিতে কখনই কোনোকিছুর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এমনকি কোনোরকম যুক্তি ছাড়া নিছক দাবীর ভিত্তিতে কোনোকিছুকে নস্যাৎ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ বলে কিছু না থাকে তাহলে সব কিছু অনির্ণীত এবং অনির্ধারিত হয়ে পরে। ফলে এমতাবস্থায় সকল আলোচনা, সমস্ত সিদ্ধান্ত অচল হয়ে পরে। এমনকি প্রতিবাদীপ্রদত্ত সিদ্ধান্তটি (প্রমাণ বলে কিছু নেই) ও তার ব্যতিক্রম নয়।

মহর্ষি গৌতম এবং তাঁর উত্তরসূরীরা উপরিউক্ত বিষয়টিকে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে প্রতিবাদীরা যে অনুমানটি দিয়েছিলেন সেই অনুমানের হেতুটি (ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিত্ব) যথাযথ নয়। কারণ হেতুটি পক্ষে (প্রত্যক্ষ) থাকে না। আর যে হেতু পূর্ব থেকে পক্ষে থাকে না সেই হেতুটি কখনও সাধ্যকে সিদ্ধ করতে পারে না। তাই প্রতিবাদীরা যেটিকে হেতু হিসাবে ধরে নিয়ে প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্যতা সিদ্ধ করছেন সেটি আদৌও সৎ হেতু নয় – সেটি হল অসৎ হেতু। ফলে প্রতিবাদী প্রদত্ত অনুমানটিতে হেত্বাভাস দেখা যায়।

আমরা জানি, কোনও সামান্য বচন তখনই মিথ্যা হয়ে যায় যদি সেই বচনের একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। যেমন- ‘সকল কাক হয় কালো’ এই সামান্য বচনটি তখনই মিথ্যা হয়ে যাবে যদি সাদা কাকের দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। সুতরাং একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত যে কোনও সামান্য বচনকে অপ্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট। একইভাবে প্রতিবাদীর ‘প্রত্যক্ষাদীনাম্ অপ্রামাণম্’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নেই, কারণ প্রমাণ

ত্রিকালে কোনও বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত হয় না। এরূপ দাবীটিকে তখনই নস্যাৎ করা সম্ভব যখন কোনও একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত প্রদান করা যায়। আর ওই ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তটি হল 'প্রমাণ বস্তুর (প্রমেয়) সঙ্গে সম্বন্ধিত' এটি তুলে ধরা। আর ঠিক এই উপায়েই নৈয়ায়িকরা অপ্রমাণবাদীদের সম্মুখীন হন। অপ্রমাণবাদীদের যুক্তির মধ্যে অসঙ্গতি এবং বিরোধীতা দেখিয়ে নৈয়ায়িকরা প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ করেন। গৌতম বলেন প্রমাণ এবং প্রমেয়ের মধ্যে সম্মন্ধ আছে। এমনকি প্রমাণ, প্রমেয়ের সম্মন্ধের ক্ষেত্রে প্রমাণ আগে নাকি প্রমেয় আগে আবার প্রমাণ পরে নাকি প্রমেয় পরে এমন কোনও ধারাবাহিকতা বা নিয়ম নেই। প্রমাণ, প্রমেয় সম্মন্ধের ক্ষেত্রে এমন কোনও নিয়ম নেই যে সর্বদা প্রমাণ প্রমেয়ের আগে থাকবে অথবা সর্বদা প্রমাণ প্রমেয়ের পরে থাকবে। এমনকি প্রমাণ প্রমেয় যে সর্বদা অথবা কিছু ক্ষেত্রে যুগপৎ সিদ্ধ হবে এমন কোনও নিয়মও নেই। পূর্ববর্তিতা, অনুবর্তীতা এবং যুগপৎসিদ্ধ এই তিনটি সম্ভাবনা প্রমাণ, প্রমেয়ের সম্মন্ধের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে মহর্ষি গৌতম প্রমাণ, প্রমেয়ের পূর্ববর্তী অথবা প্রমাণ, প্রমেয় যুগপৎসিদ্ধ - এই দুটি দৃষ্টান্তকে উদাহরণস্বরূপ ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তিনি আগে প্রমেয়ের সঙ্গে সম্মন্ধের নিরিখে প্রমাণ যে প্রমেয়ের পরবর্তী সেটি উপস্থাপন করেছেন। তিনি এটি উপস্থাপন করতে গিয়ে সুরেলা যন্ত্রের উদাহরণ দেন।[18] দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যেকেই সুরের শব্দ থেকে সুরেলা যন্ত্রের অনুমান করে থাকি, এমনকি যে সুরের শব্দ থেকে আমরা যন্ত্রের অনুমান করি সেই সুরের শব্দটি ওই যন্ত্রটি থেকেই উৎপন্ন হয়। যেমন, যখন কোনও ব্যক্তি বাঁশি বাজায় অথবা সেতার বাজায়, তখন তার বাঁশির অথবা সেতারের শব্দ অনেকদূর থেকে শুনতে

[18] 'ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধশ্চ শব্দাদাতোদ্যসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ',ন্যায়সূত্র-২।১।১৫।

পাওয়া যায়। ফলে একজন শ্রোতা দূর থেকে খুব সহজেই অনুমান করতে পারে যে, শব্দটি বাঁশির না সেতারের। এক্ষেত্রে শ্রোতা ওই বিশেষ শব্দটিকে হেতু করে (যে শব্দটি বাঁশি অথবা সেতার থেকে উৎপন্ন) বাঁশি অথবা সেতারের অস্তিত্বের অনুমান করে থাকেন। আর এই অনুমানটির মূলে থাকে বিশেষ উৎপন্ন শব্দ এবং বাঁশি অথবা সেতারের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, প্রথমে বাঁশি অথবা সেতার বাজান হয়, তারপর ওই বিশেষ শব্দটি উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বিশেষ শব্দটি প্রথমে উৎপন্ন হয়, তারপর তার থেকে ওই শব্দ উৎপন্নকারী বিশেষ যন্ত্রের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্র জ্ঞানের পূর্ববর্তী হল শব্দের জ্ঞান। আর তাই এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, পূর্বে বিদ্যমান প্রমেয়ের অস্তিত্বের জ্ঞান পরবর্তী বিদ্যমান প্রমাণের দ্বারা হওয়া দোষের নয়। ন্যায়দর্শনের গ্রন্থকার উপর্যুক্ত উদাহরণটির দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন যে প্রমাণের মধ্যে অতিতের কোনও বিষয় বা ঘটনাকে সিদ্ধ করার ক্ষমতা আছে। যদিও মহর্ষি গৌতম 'প্রমাণ পরবর্তী' হতে পারে এই বিকল্পটিকে বিশদে ব্যাখ্যা করছেন, তথাপি তার মানে এই নয় যে অবশিষ্ট সম্ভাব্য বিকল্প দুটিকে (প্রমাণ পূর্ববর্তী এবং প্রমাণ-প্রমেয় যুগপৎসিদ্ধ) অস্বীকার করছেন। এখানে বলা দরকার প্রমাণ দ্বারা যে কেবল অতীতের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হয় তা নয় বরং প্রমাণের দ্বারা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বস্তু সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। আর এই বিষয়টি আরও বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন। তিনি বলেন প্রমাণ এবং প্রমেয়ের মধ্যে কোনও ধারাবাহিক পারম্পর্য নেই। তাঁর মতে প্রমাণ এবং প্রমেয়কে জ্ঞানলাভের উপায় এবং বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে প্রমাণ এবং প্রমেয়ের অস্তিত্বের জন্যে ক্রমপর্যায় হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ জ্ঞানের উপায় এবং জ্ঞানের

বিষয়ের মধ্যে কোনও ধারাবাহিক পারম্পর্য থাকে না (অর্থাৎ কোনটি আগে, কোনটি পরে অথবা তাঁরা যুগপৎ কিনা - এমন কোনও নিয়ম নেই)।[19] পূর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, সূত্রকার প্রমাণ যে প্রমেয়ের পরবর্তী হতে পারে সেটিকে উদাহরণসহ সিদ্ধ করেছেন। এখন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রমাণের পূর্ববর্তীতা ও যুগপৎসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি এটা প্রমাণ করতে চান যে, অপ্রমাণবাদীদের (যাঁরা কিনা বলেন যে প্রমাণ এবং প্রমেয়ের মধ্যে কোনও কালে কোনও সম্মন্ধ থাকে না) দাবীটি যথাযথ নয়। বাৎস্যায়নের মতে প্রত্যেক মুহূর্তেই প্রমাণ প্রমেয়ের সমগে সম্মন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রমাণ প্রমেয়ের থেকে পূর্বে বিদ্যমান। যেমন সূর্য যা নিজে সর্বদা প্রজ্বলিত তা যেসকল বস্তুগুলিকে আলোকিত করে সেগুলি পরে আবির্ভূত হয়।[20] আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রমেয় প্রমাণের দ্বারা অনুসৃত। কারণ বস্তু আগে থেকে বিদ্যমান থাকলেও তা প্রকাশিত হতে পারে না। পরে প্রদীপ প্রজ্বলিত হলে সেই আলো দ্বারা বস্তুটি প্রকাশিত হয়।[21] আবার প্রমাণ-প্রমেয় যুগপৎ সিদ্ধ হতে পারে। যেমন আগুনের অনুমানের ক্ষেত্রে যখন ধোঁয়াকে হেতু হিসাবে ধরা হয়। এর থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রমাণের উপস্থিতির কোনও চূড়ান্ত নিয়ম বলে কিছু নেই। আর যেহেতু

---

[19] 'যত্তাবত্ পূর্বোক্তমুপলব্ধিহেতোরূপলব্ধিবিষয়স্য চার্থস্য পূর্বাপরসহভাবানিয়মাদ্ যথাদর্শনং বিভাগবচনমিতি, তদিতঃ সমুত্থানং যথা বিজ্ঞায়েত', তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪৩০।

[20] 'ক্কচিদুপলব্ধিহেতুঃ পূর্বম্, পক্ষাদুপলব্ধিবিষয়ঃ, যথাদিত্যস্য প্রকাশ উৎপদ্যমানানাম্', তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪২৩।

[21] 'ক্কচিৎপূর্বমুপলব্ধিবিষয়ঃ পশ্চাদুপলব্ধিহেতুঃ, যথাঅবস্থিতানাং প্রদীপঃ'- তদেব।

প্রমাণ ত্রিকালে সিদ্ধ সেহেতু প্রমাণের গুরুত্বকে কখনও অস্বীকার করা অথবা সংশয় করা সম্ভব নয়। ফলে প্রতিবাদী (অপ্রমাণবাদী) কর্তৃক নিষেধ উক্তিটি (প্রত্যক্ষ ইত্যাদি প্রমাণের প্রামাণ্য নেই) যৌক্তিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে বিশ্বনাথ উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, প্রতিবাদীকে তাঁর নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করা দরকার। যদিও সম্ভবত প্রতিবাদী বলতে পারেন যে তাঁরা তাঁদের অবস্থানের সমর্থনে কখনও কিছু বলেন না। কারণ নিজেদেরকে শূন্যবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করার পর কোনও বচনের অনুমোদন না করাই স্বাভাবিক। তাই যদি প্রতিবাদীর নিজের কোনও অবস্থান বা বচন না থাকে তাহলে তাকে উক্ত বচনটি (প্রত্যক্ষাদিনাম্ প্রামাণ্যাম্ ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি) প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনও প্রমাণকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। বরং বিপরীতে তিনি দাবী করতে পারেন যে এটা কেবলমাত্র প্রমাণবাদীদেরই দায়িত্ব প্রমেয়ের সঙ্গে সম্মন্ধ দেখিয়ে প্রমাণকে প্রতিষ্ঠা করা। ভাষাপরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ প্রতিবাদীদের উক্ত মতটিকে যথাযথ বলে মনে করেন না। বিশ্বনাথ প্রতিবাদীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে অপ্রমাণবাদীদের (প্রতিবাদীদের) প্রমাণবাদীদের প্রমাণ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ প্রমাণবাদীদের দৃষ্টিতে প্রমাণ প্রমেয়ের সঙ্গে ত্রিকালে সম্মন্ধযুক্ত।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রমাণ প্রমেয়ের সঙ্গে ত্রিকালে সম্মন্ধযুক্ত নয় এমন তথাকথিত দাবীটি যে ভিত্তিহীন সেটি নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু প্রমাণ ও প্রমেয়ের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে আরও অন্য আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। সেই আপত্তিটি হল প্রমাণ এবং প্রমেয় কেউই স্বতন্ত্র নয়, তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রমাণ এবং প্রমেয়ের বিরুদ্ধে এই আপত্তিটি মূলত নাগার্জুন উত্থাপন করেছিলেন। নাগার্জুন তাঁর *বৈদল্যপ্রকরণ* গ্রন্থে দাবী করেন যে কোনও কিছু তখনই প্রমাণ হতে পারে যখন

প্রমেয় বিষয় বলে কিছু থাকে। আবার একইভাবে কোনোকিছু তখনই প্রমেয় হতে পারে যখন প্রমাণ বলে কিছু থাকে। সহজ কথায় প্রমেয় সাপেক্ষে যেমন একটি প্রমাণ প্রমাণ বলে গণ্য হয় তেমনি প্রমাণ সাপেক্ষে প্রমেয়ের প্রমেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি বিষয়টিকে আরও বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন একজন ব্যক্তি পিতা বলে গণ্য হতে পারেন কেবল অন্য এক ব্যক্তির সম্মন্ধের ভিত্তিতে, যাকে ওই ব্যক্তির পুত্র বা সন্তান বলা যায়। একইভাবে একজন পুত্র পুত্র বলে বিবেচিত হয় একজন পিতার (মাতার) সঙ্গে সম্মন্ধের ভিত্তিতে। একইভাবে প্রমেয়ের জন্যই প্রমাণ সিদ্ধ হয় প্রমাণ হিসাবে। প্রমেয় প্রমেয় হিসাবে গণ্য হয় প্রমাণের জন্য। কাজেই প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় প্রমাণের প্রমেয়। আর প্রমেয় হয়ে দাঁড়ায় প্রমাণের প্রমাণ। নাগার্জুন আরও বলেন যেহেতু প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় সিদ্ধ হয় সেহেতু প্রমাণ হয় পরে সাধন এবং প্রমেয় হয় সাধ্য। আবার প্রমাণ প্রমেয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রমাণকে সাধ্য এবং প্রমেয়কে সাধন বলতে হয়। সুতরাং উভয়েই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য হওয়ায় উভয়ের প্রমাণত্ব প্রমেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই নাগার্জুন সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে কোনোরকম তফাৎ করা অযৌক্তিক এবং সর্বোপরি তারা শূন্য।[22] উপরিউক্ত আপত্তিটি মূলত *ন্যায়সূত্র* এবং তার ভাষ্যে উত্থাপিত হয়েছে। যদিও এখানে গৌতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্বপক্ষী কে বা কারা সেই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি। তথাপি আপত্তিটির খণ্ডন করতে গিয়ে সূত্রকারের ‘প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ’ এরূপ উত্থাপন থেকে বাচস্পতি মনে করেন যে এখানে পূর্বপক্ষী হল মূলত মাধ্যমিক সম্প্রদায়। যাঁরা প্রমাণ-প্রমেয় বিভাজন স্বীকার করেন তাঁদের বিরুদ্ধে অপ্রমাণবাদীরা মূলত যে আপত্তিটি

[22] Nāgārjuna, *Vaidalyaprakaraṇa* Trans by Tola Fernando and Dragonetti Carmen. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, p-58.

তুলতে পারেন সেটি উত্থাপন করতে গিয়ে তাৎপর্যকার বলেন 'যৎপুনরাক্ষিপ্যতে যদনিতং ন তৎ পরমার্থসত্, যথা রজ্জ্বামারোপিতং সর্পত্বম্, তামেব হি রজ্জুং তদৈব কক্ষিতসর্প ইতি কল্যয়তি; স এব কদাচিতসর্প ইতি কল্পয়িত্বা পক্ষাদ্রুরেতি কল্পয়তি, তথা চ প্রমাণপ্রমেয়ভাবস্তস্মান্ন পরমার্থসন্নিতি'।[23] এখানে বাচস্পতি পূর্বপক্ষীর সমর্থনে যে বিষয়টি তুলে ধরতে চান সেটি হল যেসকল বস্তুর ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা সম্ভব নয় তাদেরকে কখনও পারমার্থিক সৎ হিসাবে গণ্য করা যায় না। বাচস্পতি বিষয়টিকে বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে কোনও বস্তু ধরাযাক দড়ি, সেটি একইসময়ে কখনও কারও কাছে সাপ হিসাবে প্রতীয়মান হয়, আবার কারও কাছে দড়ি হিসাবেও প্রতীয়মান হয়। এমনকি একই ব্যক্তির কাছে দড়িটিতে কখনও সর্পত্ব ধর্ম আরোপিত হয়, আবার কখনও রজ্জুত্ব ধর্মও আরোপিত হয়। যেহেতু বস্তুটির নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের নিরূপণ করা সম্ভব নয় (অর্থাৎ একই বস্তুকে দুটি ভিন্ন সময় দুটি ভিন্নরূপে কল্পনা করা যায়) সেহেতু তাকে সৎ বলা সম্ভব নয়। আর ঠিক একই যুক্তিতে প্রমাণ ও প্রমেয়ের বিভাজনের দাবীটিকে যথাযথ বলা যায় না। কারণ প্রমাণ প্রমেয়ের মধ্যেও কোনও নিয়মানুবর্তীতা বা ধারাবাহিকতা নিরূপণ করা যায় না।

উপর্যুক্ত আপত্তিটির উত্তর পাওয়া যায় বাৎস্যায়ন ভাষ্যে। যদিও উপর্যুক্ত আপত্তিটি বাৎস্যায়ন ভাষ্যে উল্লেখিত হয়নি, তথাপি অপ্রমাণবাদী দ্বারা উপর্যুক্ত আপত্তিটির যথাযথ উত্তর ন্যায়দর্শনের ১৬ নং সূত্রের ভাষ্যে তিনি উল্লেখ করেন। বাৎস্যায়ন প্রমাণ প্রমেয়কে পদার্থ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন যে, একই বস্তুকে প্রমাণ

[23] তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪৩২।

প্রমেয় হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, কোনও নাম বস্তুর সঙ্গে সম্মন্ধযুক্ত হয় সেই বস্তুর ক্রিয়াকলাপ এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। প্রমাণ অভিধাটি মূলত জ্ঞানোৎপত্তির উপায়কে সূচীত করে। আর প্রমেয় বলতে বোঝায় জ্ঞানের বিষয়কে। এখন যদি ঘটনাবশত জ্ঞানীয় বিষয়টি অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে জ্ঞানের উপায় হয়, তাহলে প্রমাণ, প্রমেয় উভয়ই প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, তাতে কোনও ভ্রান্তি থাকে না। 'প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ'[24] এই সূত্রের মাধ্যমে মহর্ষি গৌতম উপরিউক্ত বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন যে সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনটি নিয়ম বহির্ভূত কোনও বিষয় নয়, বরং তা আমাদের সাধারণ পরিকল্পনার বিষয় হিসাবে গৃহীত হয় এবং তারমধ্যে কোনও ভুল নেই। আবার বাৎস্যায়ন তুলা যন্ত্রের উদাহরণকে তুলে ধরে বলেন কোনও একটি বিষয় এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেমন জ্ঞানীও উপাদান হতে পারে, তেমনি অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটি জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। তুলা যন্ত্রের দ্বারা মূলত সোনা, রূপো ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যের গুরুত্বের (ওজন) পরিমাণ করা হয়। কিন্তু পূর্বে পরিমাপিত সোনা, রূপার ক্ষেত্রে বর্তমানে যদি তার পরিমাণের যাথার্থ্যতা সম্পর্কে কোনও সংশয় উৎপন্ন হয় তবে সেটি পুনরায় বিচার্যের উপায় হিসাবে গণ্য হয়।[25] একই পরিমাণ যাকে কোনও একসময় প্রমাণ অথবা পরিমাপের উপায় হিসাবে গণ্য হয় সেটি আবার ভিন্নসময় পরিমাপের বিষয় হয়ে যায়। ভাষ্যকার এই বিষয়ে আরও বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত আত্মার কথা বলেন।

---

[24] ন্যায়সূত্র- ২।১।১৬।

[25] 'গুরুত্বপরিমাপজ্ঞানসাধনং তুলা প্রমাণাম্, জ্ঞানবিষয়ো গুরু দ্রব্যং সুবর্ণাদি প্রমেয়ম্। যদা সুবর্ণাদিনা তুলান্তরং ব্যবস্থাপ্যতে তদা তুলান্তরপ্রতিপত্তৌ সুবর্ণাদি প্রমাণং তুলান্তরং প্রমেয়মিতি', তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, ন্যায়দর্শনম্, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৩৬-১৯৪৪, পৃঃ-৪৩৩।

তাঁর মতে আত্মা হল প্রথম প্রমেয় পদার্থ বা জ্ঞানের বিষয়।[26] আবার এই আত্মাকেই তিনি জ্ঞাতা হিসাবে উল্লেখ করেন। বুদ্ধি যেমন জ্ঞানের উপায় হিসাবে প্রমাণ হয় তেমনি তাকে আবার জ্ঞানের বিষয় হিসাবে প্রমেয় বলা হয়ে থাকে। এখন উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটি থেকে এটা স্পষ্ট যে কোনও বস্তু ক্রিয়ামূলক ধর্মের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আর বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্যই তার সংজ্ঞা বা উপাধি পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। আর বস্তুর এই ভিন্নতা কখনই সেই বস্তুর সংজ্ঞার স্বরূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। একই যুক্তিতে প্রমাণ, প্রমেয়ের নিয়মানুবর্তীতার অভাব কখনই তাদের নিজ স্বরূপের বা সত্তার হানি ঘটাতে পারে না। একইভাবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনও একটি বস্তুকে বিভিন্ন অভিধা বা সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করে থাকি। যেমন একজন মহিলাকে কখনও 'কন্যা' হিসাবে, কখনও 'স্ত্রী' হিসাবে, আবার কখনও 'মা' হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মাতৃত্ব, কন্যাত্ব ইত্যাদি ধর্মগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র চারিত্রিক ধর্ম নয়। কন্যা হওয়া ধর্মটি কারোর মধ্যে বিদ্যমান হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁর মধ্যে মাতৃত্ব বা ভগিনীত্ব ধর্মটি না থাকা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি হিসাবে যে অট্টালিকাটি আমাদের সকলের কাছে সুপরিচিত সেটি আবার রবীন্দ্রনাথের বাড়ি, *গীতাঞ্জলি* কাব্যের রচয়িতার বাড়ি হিসাবেও পরিচিত। অর্থাৎ একই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। ফলস্বরূপ একই বস্তু প্রমাণ ও প্রমেয় হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা যায় না। সুতরাং সেটির বিরোধীতার কোনও প্রশ্নই নেই।

---

[26] তদেব, পৃঃ-৪৩৯।

সপ্তম অধ্যায়

সিদ্ধান্ত

সংশয় একটি অনস্বীকার্য ব্যাপার। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রায়ই কোনো না কোনো সময় এই অস্বস্তিকর অবস্থাটির মুখোমুখি হতে হয়। যেখানে বিষয়টি এরকম না ওরকম, একটি কাজের ফল ভালো হবে নাকি মন্দ হবে, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। এক দিক থেকে দেখলে এই সংশয় ক্ষতিকর, বিশেষত ধার্মিকদের দৃষ্টি থেকে দেখলে সংশয়মূলক অবস্থান কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে 'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'[1] অর্থাৎ যে আত্মা সংশয়ই তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাঁর কোনও প্রকার জ্ঞান নেই, কোনও বিষয়ে শ্রদ্ধা নেই অথবা যাঁর চিত্ত সংশয় দ্বারা আচ্ছন্ন এরূপ ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সন্দেহপূর্ণ চিত্ত ব্যক্তির ইহলোক নেই, পরলোক নেই, সুখও নেই। অর্থাৎ ইহলোক বা পরলোক কোথাও তাঁর কল্যাণ হয় না। ধর্মের পথে সংশয় হল একটি প্রতিবন্ধক। যদি মন সংশয়ী হয় তাহলে ধর্মের পথে সাফল্য আসা দুরূহ হয়ে পরে। গুরুর বচন সম্বন্ধে যদি মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং তা নিয়ে উপদিষ্ট পথে ব্রতী হয়ে তা মঙ্গলজনক কিনা সে সম্বন্ধে যদি মনে কোনও সংশয় থাকে তাহলে সমগ্র হৃদয় দিয়ে উপাসনার পথে ব্রতী হওয়া ভক্তের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পরে। তাই ধর্মীয় জীবনে সংশয় মানুষকে বিপথগামী করে তোলে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনে নয় পারিবারিক ও সমাজ জীবনে সংশয়ের বিষময় ফল ফলতে দেখা যায়। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া পরিবার ও সমাজজীবন অটুট

[1] ভগবদ্গীতা ৪/৪০।

থাকতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত নিয়ে জীবনযাপন সন্দেহকারীকে যেমন সুখী করে না, তেমনি যাদের দিকে সেই সন্দেহের তীর ধাবিত হয় তাদের পক্ষেও সুখী হওয়া অসম্ভব হয়ে পরে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে যদিও সংশয়ের নঞর্থক দিকটি পরিস্ফুটিত হয় তথাপি সংশয়ের কিছু সদর্থক ভূমিকাও লক্ষণীয়। অর্থাৎ সংশয় দ্বারাও আমরা দৈনন্দিন জীবনে কিছু সাফল্য লাভ করে থাকি। আর এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম। হিউম দু'ধরনের সংশয়ের কথা বলেছিলেন। যথা- জ্ঞানমূলক (academic) সংশয় এবং মৃদু (mitigreted) সংশয়।[2] প্রথম প্রকার সংশয় একধরনের সার্বিক সন্দেহকে নির্দেশ করে যার হাত থেকে কোনোকিছু নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। এমনকি চিন্তনকারী সত্তা হিসাবে ব্যক্তির আপন অস্তিত্বও (যে চিন্তনশীল অহং-এর কথা একসময় ফরাসি দার্শনিক রেঁনে দেকার্ত বলেছিলেন) সেইসব থেকে রেহাই পায় না। এই সর্বগ্রাসী সংশয়কে তত্ত্বগতভাবে অনুমোদন করলেও কখনই তা অনুশীলনের কথা বলেননি হিউম। তিনি শুধু এটাই বলতে চেয়েছেন যে মানুষের বোধবুদ্ধি সম্বন্ধে বিচারমূলক বিশ্লেষণ করলে তার পরিণতি হিসাবে আমাদের ওই সার্বিক সংশয়ে উপনীত হওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকে না। তবে ওই সার্বিক সংশয়ের অনুশীলন এক সার্বিক নৈষ্কর্মের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের। তাই সংশয়কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি তিনি। তবে ব্যাবহারিক জীবন নির্বাহে সফল হওয়ার নিদান হিসাবে হিউম একধরনের মৃদু সংশয় অনুশীলনের পক্ষপাতী। কিছুটা সংশয়ের মনোভাব নিয়ে পথ চললে আখেরে যে উপকারই হয় আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা

---

[2] Hume David, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Calcutta Progressive Publishers, P-128-129.

থেকে তা আমরা জানতে পারি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে একটা অনিশ্চয়তার মনোভাব রাখলে আমরা ব্যর্থতাকে কিছুটা অতিক্রম করতে পারি, অথবা ব্যর্থতা যে একটি সম্ভাব্য পরিণতি সেকথা ভেবে আশ্বস্ত হতে পারি। সদ্য পরিচিত কোনও ব্যক্তিকে নির্বিবাদে বিশ্বাস না করে তার সম্বন্ধে কিছুটা সংশয় পোষণ করা যে ভালো অভিজ্ঞ ও দূরদর্শীরা সেকথা বলে থাকেন। নির্বিচারবাদের বিপরীতে রাখলে সংশয়বাদ একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান বলে মান্যতা পেতে পারে। কারণ নির্বিচারবাদ এক ধরনের সার্বিক আস্থাবাদ, যা কোনোকিছু সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে না, বরং সবকিছুকে স্বীকার্য বলে মেনে নেয়। তাই এ ধরণের নির্বিচারবাদী মনোভাব যেমন চিন্তার বিকাশে বিঘ্ন ঘটায় তেমনি নতুন কিছু গড়ে তোলার বা আবিষ্কারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিচারশীল প্রাণী মানুষের কাছে এরকম একটা অবস্থান কখনোই কাম্য হতে পারে না। অবশ্য সার্বিক সংশয়বাদও সমানভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সংশয়ের আংশিক প্রয়োগ প্রাত্যহিক জীবনে অনেক বেশি ফলপ্রদ হয়।

বিজ্ঞান ও দর্শনের দিক থেকে বিচার করলে সংশয় শুধু যে চিন্তার অপরিহার্য একটি দিক তাই নয়, এ যাবতীয় আবিষ্কারের, যাবতীয় চিন্তার উন্মেষের উৎস স্বরূপ। বিস্ময়কে দর্শন চিন্তার জননী হিসাবে দেখে থাকেন পাশ্চাত্য চিন্তকরা। এই বিস্ময় আসলে সংশয়ের অন্য নাম। কারণ কোনও ঘটনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দানের অক্ষমতা থেকেই তাকে অদ্ভুত বা বিস্ময়কর ভাবা শুরু হয়। যেখানে সাধারণ বিচার বুদ্ধি দিয়ে কোনও ব্যাখ্যা মেলে না সেখানে উৎপন্ন হয় সংশয়, আর সেখানেই থাকে বিস্ময়। কাজেই বিস্ময়কে দর্শন চিন্তার উৎস বলে মেনে নিলে দর্শন চিন্তার বিকাশে সংশয়ের গুরুত্বই স্বীকার করা হয়।

ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সংশয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ন্যায়শাস্ত্র হল আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। এই বিদ্যার বিশেষ প্রস্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হল সংশয়। মহর্ষি গৌতম সংশয়ের কথা বলতে গিয়ে বলেন 'সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্ব্বি প্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ'[3]। সংশয় ব্যতিরেকে কোনও যুক্তি বা ন্যায়ের প্রয়োগ করা যায় না। যে পদার্থ সম্পূর্ণ জ্ঞাত সে সম্বন্ধে যেমন ন্যায় যুক্তির প্রয়োগ হয় না, তেমনি যে পদার্থ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সেই বিষয়েও ন্যায় বা যুক্তির প্রয়োগ করা যায় না। একমাত্র সন্দিগ্ধ পদার্থকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় যুক্তি, তর্ক ও আলোচনার অবতারণা হয়ে থাকে। আর তাই সংশয় হল সকল বিচারের পূর্বাঙ্গ স্বরূপ। সেকথা বিবেচনা করে প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থের উল্লেখের পর পৃথকভাবে সংশয় পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে *ন্যায়সূত্রে*। জাগতিক সকল বিষয়ই প্রমেয় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। আর সেই হিসাবে সংশয়ও প্রমেয়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে পৃথকভাবে সংশয় পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে ন্যায় দর্শনে।[4]

ন্যায় দর্শনে সংশয়ের গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও নৈয়ায়িকরা সংশয়বাদী নন। উপরন্তু সংশয়বাদী পূর্বপক্ষীর পক্ষ সাধন করাই তাদের উদ্দেশ্য। তথাপি বৈতণ্ডিক ও সর্বশূন্যবাদী পূর্বপক্ষীর পক্ষ সাধন করতে গিয়ে যে ন্যায় গ্রন্থগুলির বিস্তার ঘটেছে তা অস্বীকার করা যায় না। এভাবে দেখলে ভারতীয় দর্শন সাহিত্যের অগ্রগতিতে সংশয়বাদের যে একটি সদর্থক ভূমিকা রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। লক্ষ করলে

[3] গৌতম, ন্যায়সূত্র ১/১/২৩, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

[4] গৌতম, ন্যায়সূত্র ১/১/১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

দেখা যাবে যে ভারতীয় শাস্ত্রগুলির উত্থান মূলত তত্ত্ব বিচারের পথ ধরে। তত্ত্ব বিষয়ে যে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেগুলির খণ্ডন করে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেছে প্রতিটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়। অনুমান যে একটি প্রমাণ হিসাবে অবশ্য স্বীকার্য সেকথা প্রমাণ করতে গিয়ে চার্বাকদের পূর্বপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে যুক্তির অবতারণা করেছে প্রায় প্রতিটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়। জড়বাদী চার্বাকদের দেহাত্মবাদ এবং বৌদ্ধের নৈরাত্ম্যবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে গভীর যুক্তিজাল রচনা করেছে আস্তিক সম্প্রদায়গুলি। আত্ম বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি বাক্যগুলিকে খণ্ডন করতে গিয়ে গড়ে উঠেছে *আত্মতত্ত্ববিবেক*-এর মতো দার্শনিক গ্রন্থ। ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্বে নাস্তিকদের সংশয় নিরাস করতে গিয়ে রচিত হয়েছে *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*। প্রমেয় বিষয়ে সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরাস করতে গিয়ে যেমন তত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি তেমনি প্রমাণ বিষয়ে সংশয়ের খণ্ডন ও মণ্ডন করতে গিয়ে প্রমাণ শাস্ত্রের সূক্ষাতিসূক্ষ বিচারগুলির উন্মেষ ঘটে। এমনকি ধর্ম ও নীতি বিষয়ক যে আলোচনা ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রগুলিকে অনন্যতা দান করে তার বিকাশেও নাস্তিক পূর্বপক্ষীদের ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত, নাগার্জুন ও মাধ্যমিক বৌদ্ধরা যে সংশয়বাদী ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন তার প্রভাব লক্ষ করা যায় দর্শন শাস্ত্রের অগ্রগতিতে। নাগার্জুন পূর্ববর্তী মাধ্যমিকরা যে শূন্যবাদ প্রচার করেন তার নিরসন করতে গিয়ে রচিত হয় গৌতমের *ন্যায়সূত্র*-এর মতো গ্রন্থ। আবার গৌতম ও তাঁর পূর্ববর্তী নৈয়ায়িকদের আপত্তি খণ্ডনে নাগার্জুন যেসব যুক্তির অবতারণা করেন সেগুলির প্রত্যুত্তর লক্ষ্য করা যায় বাৎস্যায়নের রচনায়। বাৎস্যায়নের ওইসব যুক্তিগুলির খণ্ডন করেন চন্দ্রকীর্তি তাঁর প্রসন্নপদা টীকায়। আবার চন্দ্রকীর্তির উত্তরের প্রত্যুত্তর দানের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় বাৎস্যায়ন পরবর্তী নৈয়ায়িকদের রচনায়। এভাবে পক্ষ-প্রতিপক্ষ, যুক্তি-প্রতিযুক্তির হাত

ধরে দর্শনশাস্ত্র তার অগ্রগতি ঘটিয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে। নিঃসংশয়বাদী দর্শন সৌধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংশয়বাদের যেমন একটি ভূমিকা রয়েছে তেমনি একটি দার্শনিক অবস্থান ও সম্ভবনা হিসাবেও সংশয়বাদের ভূমিকা লক্ষ্যনীয়। আবার দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও বাস্তববোধের সঙ্গে মানানসই নয় বলে সংশয়বাদকে প্রায়শই উপেক্ষিত ও অবহেলিত হতে লক্ষ করা যায়। অনেক উপহাস ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সইতে হয়েছে সংশয়বাদীদের। কিন্তু বাস্তব বিমুখতাকে কোনও একটি অবস্থান বা তত্ত্বের অপকর্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। বাস্তব বিমুখতার দোহাই দিয়ে কোনও একটি মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য 'A sceptic is not an aggressor into the Temple of Truth, but he shares the same concern for truth with the philosopher and is reluctant to accept anything less'।[5] দার্শনিক ও সংশয়বাদী উভয়েই একই পথের পথিক, উভয়েই সত্যানুসন্ধানী। সংশয়ের পথে অগ্রসর হতে হয় উভয়কেই। তবে দার্শনিক সবসময় ও পরিমিত পরিমানে যে সংশয়ের অনুশীলন করেন সংশয়বাদীর ক্ষেত্রে তার অনুশীলন স্থায়ী ও তীব্র। আর যতক্ষণ না কোনও সংশয়াতীত সত্যকে পাওয়া যায় তার আগে কোনোকিছুকে নিঃশর্ত ছাড়পত্র দিতে রাজী নন তিনি।

একটু খতিয়ে দেখলে লক্ষণীয় যে সংশয়বাদের অনুশীলন তথাকথিত প্রমাণবাদী বহু ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান। সাধারণভাবে জৈনদের সংশয়বাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় না। স্যাৎ অস্তি, স্যাৎ নাস্তি এইভাবে বস্তু সম্বন্ধে অবধারণ গঠন করেন তাঁরা। এই হিসাবে বস্তু স্বরূপ অজ্ঞাত বা সংশয়মূলক এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কিন্তু

[5] Motilal B.K, 'An Exercise in Scepticism', Research Bulletin of Philosophy Vol-I. No.I, Jadavpur University, March 1984.

মনে রাখতে হবে যে জৈন সম্প্রদায় 'অনেক ধর্মক' বস্তুর কথা বলেন। বস্তুর ঐ অনন্ত ধর্মের সবগুলিকে জানা কোনও লৌকিক পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আপেক্ষিকভাবে কোনও বস্তুকে সৎ বা অসৎ- অস্তি বা নাস্তি বলে বর্ণনা করা গেলেও দেশ, কাল নিরপেক্ষভাবে তার স্বরূপ 'অবক্তব্য'। কাজেই বস্তু সম্বন্ধে অনপেক্ষ কোনও নির্ধারণ বা নির্বাচন জৈন দর্শনে স্বীকৃত হয়নি। বস্তু স্বরূপের এই অনির্ধারণ যোগ্যতা তার সংশয় যোগ্যতার পথই প্রশস্ত করে। শাশ্বতবাদ ও নৈরাত্মবাদ পরিহার করে জৈনরা আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই আপেক্ষিকতাবাদের অনিবার্য পরিণতি হল সংশয়বাদ। তবে একথা ঠিক যে কেবলিদের ক্ষেত্রে সংশয়াতীত ও অনপেক্ষ জ্ঞান জৈন দর্শনে অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু ঐ জ্ঞান আসলে এক লোকোত্তর জ্ঞান, যার অধিকারী ব্যক্তি কোটিকে গুটিক। সাধারণ লৌকিক পুরুষের যে জ্ঞান তা আপেক্ষিক – তা সংশয়ের উর্ধ্বে নয়।

জগৎ বিষয়ক যে জ্ঞান তা সংশয়াতীত নয়। প্রকারন্তরে সেই মত সমর্থন করেন অদ্বৈতবেদান্তীরাও। অদ্বৈতীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং সৎ পদার্থ। জাগতিক বিষয় যাদের আমরা সচরাচর সৎ বা অসৎ বলে অভিহিত করি, তাদের সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। তাই বেদান্তী জাগতিক বস্তুকে সৎ অসৎ বিলক্ষণ অনির্বচনীয় বলেছেন। এই অনির্বচনীয়বাদ সংশয়বাদেরই অন্য নাম। জাগতিক বস্তুর স্বরূপ যে স্বরূপত নিরূপণের অযোগ্য মাধ্যমিক ও জৈন সম্প্রদায়ের মতো অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায়ও সেই মহা সত্যটিকে স্বীকার করে নেন।

গ্রন্থপঞ্জি

- Annas, J. (1996), 'Scepticism, Old and New' in M. Frede and G. Striker, eds., *Rationality in Greek Thought*, (Oxford: Clarendon).
- Annas, J. (1990), 'Stoic Epistemology', in S. Everson, ed., *Epistemology*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Annas, J. and Barnes, J. (1985), *The Modes of Scepticism*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Bett, R. (2000), *pyrrho, his antecedents, and his legacy*, (Oxford: Oxford University Prees).
- Brennan, T. (1999), *Ethics and Epistemology in Sextus Empiricus*, (New York: Garland).
- Burnyeat, M., Ed. (1983), *The Skeptical Tradition,* (Berkeley: University of California Press).
- Bury, R.G., Trans. (1990), Outline *of Pyrrhonism, Sextus Empiricus,* (Newyork: Prometheus Books).
- Murti, T.R.V. (1955). *The Central Philosophy of Buddhism*. Kolkāta: Vikas΄Publishing House Pvt. Ltd.
- Derose, K. and warfield, Ted A., Eds. (1999), *Skepticism: A Contemporary Reader,* (Newyork, Oxford: Oxford University Press).
- Fogelin, R. (1994), *Pyrrhonian Reflections on Knowledge and Justification,* (Oxford: Oxford University Press).
- Rescher, N. (1980), *Scepticism: A Critical Reappraisal,* (Oxford: Basil Blackwell Publisher).
- Stroud, B. (1984), *The Significance of Philosophical Scepticism,* (Oxford: Clarendon Press).

- Mates, E. (1981), *Skeptical Essays,* (Chicago and London: The University of Chicago Press).
- Sāhā, Sr., Ed. (1997), *Essays in Indian Philosophy*, (Department of Philosophy, Jadavpur Unversity: Allied Publishers).
- Bhattāchārya, B., (1987), *Absolute Skepticism Eastern and Western*, (Prajana Publication).
- Tiwari, H., Eds. (2004), *Logical and Ethical Issues,* Motilāl, B.K. (New Delhi: Chronicle Books).
- Tola, F. and Dragonetti, C., (1995), *Vaidalyaprakaraṇa,* (Delhi: Motilāl Banārsidāss Publishers Pvt. Ltd.).
- Kalupahana, David J., (1991), *Mulamadhyamakārikā of Nāgārjuna*, (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.).
- Singh, J. (1968), *Madhyamaka Philosophy*, (Varānasi: Motilāl Banārsidāss Publishers Pvt. Ltd.).
- Jhā, M.G., (1984,1999), *The Nyāya-Sutras of Gautama*, (Valume: i & ii), (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.).
- Sanghavi, P.S and Parikh, Rasiklal C. eds, (1987) *Tattvopaplavasiṁha of Shri Jayarāṡhi Bhatta.* Varanasi: Bauddha Bharati.
- তর্কবাগীশ, পণ্ডিত ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, জুন, (১৯৮৩)।
- সরকার, প্রয়াস, (২০০৯), *জ্ঞান, সংশয়বাদ ও যুক্তিসিদ্ধি প্রসঙ্গে,* (প্যাপিরাস)
- শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)
- Motilāl B.K, *Perception,* Clarendon Press, Oxford, 1986.

- Tārānātha Nyāya-Tarkatīrtha and Amarendramohan Tarkatīrtha. Eds, (1985). *Nyāyadarsánam.* Calcutta: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.
- Guptā, Ritā. (2006). *The Buddhist Concepts of Pramāṇa and Pratyaksa.* Calcutta: Sundeep Prakashn.
- Sŕīharṣa, *Khandanakhandakhādyan.* Ed. Mahamahopadhyay Shri Shrīmohan Bhattāchārya Tarkavedāntatīrtha. Kolkata: Ramkrishna Mission Institution of Culture.
- Sen, Debabrata. (1984). *The Concept of Knowledge*. Calcutta: KP Bagchi and Company.
- Prasad, Jwala. (1956). *History of Indian Epistemology*. Delhi: Munshi Ram Manohar Lal.
- Bhattāchārya, Kamalesẃar. (1978), *The Dialectical Method of Nāgārjuna (Vigrahavyāvartanī).* Delhi: Motilal Banarsidass.
- Bharadvāja, Uddyotakara. *Nyāyabhāṣyavārttika.* ed. Anantalāl Thākur. (1997). New Delhi: Indian Council of Philosophical Research.